MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
অনলাইন বুলেটি-৩
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র । জুন ২০২০

‘করোনাকালের অর্থনীতি, করোনাত্তোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বাজেটে অগ্রাধিকার খাত কী হওয়া উচিত’ শীর্ষক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত

বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে ৩০ মে ২০২০ সকাল ১১টায় ‘করোনাকালের অর্থনীতি-করোনাত্তোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং আগামী বাজেটে অগ্রাধিকার খাত কী হওয়া উচিত’ শীর্ষক এক অনলাইন মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাম জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব ড. সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক এম.এম. আকাশ, সিপিডি’র সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, বিআইডিএস এর গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়ক সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শারমিন্দ নিলোর্মী ডালিয়া এবং বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য সিপিবি সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী কমরেড জুনায়েদ সাকী, কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু, বাসদ (মার্কসবাদী)’র নেতা কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক কমরেড হামিদুল হক।

মতবিনিময়সভার শুরুতে সঞ্চালক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ সূচনা বক্তব্যে বলেন, এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য বিপর্যয় করোনা সংক্রমণ শুধু স্বাস্থ্য খাতে রাষ্ট্রের অবহেলা ও মানুষের অসহায়ত্ব তুলে ধরেছে তাই নয়, উন্মোচন করেছে উন্নয়নের গল্প ও অর্থনীতির দুর্বলতা কোথায়। আমাদের অর্থনীতি যে চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স, কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। করোনা সংক্রমণেরকালে এর প্রত্যেকটিই সংকটের মুখে। রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আয় করে যে খাত

সেই গার্মেন্টস খাতের নড়বড়ে চেহারা আর মালিকদের দায় না নেবার মানসিকতা থেকে এটা পরিস্কার হয়েছে যে প্রণোদনা, মুনাফা আর শ্রম শোষণের মধ্য দিয়ে যে খাতের বিকাশ, অর্থনৈতিক দুর্যোগে তাঁরা কতটা সুযোগ সন্ধানী। ৪০ বছরের শিল্প মাত্র ৩ মাসে এতটাই কাহিল হয়ে পড়েছে যে রাষ্ট্রের প্রণোদনা অর্থাৎ জনগণের টাকা ছাড়া সে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। এবার প্রমাণ হলো গার্মেন্টস খাত এমন এক বৃক্ষ যে সে ফুল ফল তো দূরের কথা ছায়া দেয়ারও ক্ষমতা রাখে না। এই করোনায় দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে সবচেয়ে উপেক্ষিত খাত বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক। শুধু ভাতের সংস্থান করা নয়, সবজি, মাছ, ডিম, মুরগি, দুধ, মাংস, ফল কোন কিছুর-ই অভাব বোধ করতে দেয়নি যে খাত, গত বাজেটেও সবচেয়ে উপেক্ষিত ছিল কৃষি মাত্র ৩.৫ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছিল।

ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, সবজি চাষির দুঃখ, মৌসুমি ফল নিয়ে বিড়ম্বনায় উৎপাদক, পোলট্রি খামারির দুর্ভোগ, দুগ্ধ চাষি বিপাকে এসব ছিল পত্রিকার নিয়মিত হেড লাইন।

দেশের অর্থনীতির আর একটি বড় চালিকাশক্তি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। দেশের অর্থনৈতিক আয়তনের ৫০ শতাংশ সরবরাহ করে এই খাতের শ্রমজীবিরা। তাদের কাজ নাই তো মজুরি নাই। গত ৪ মাসে তাদের জীবন কীভাবে কেটেছে তার বর্ণনা দেয়া কঠিন। ৭৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, আর সবমিলিয়ে চুরিচামারিসহ দেড় লাখ টন চাল ছিল বরাদ্দ। ৬ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমশক্তির সাড়ে পাঁচ কোটিই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের। তাঁরা কতটুকু সহায়তা পেয়েছে তার হিসেব বের করা কঠিন। করোনা এদেরকে নিম্নবিত্ত থেকে দরিদ্রের কাতারে নামিয়ে এনেছে। নতুন পুরাতন মিলে দরিদ্র সীমায় পৌছানো মানুষ মোট জনসংখ্যার ৪৩%।

চিকিৎসা খাতে বাজেট বরাদ্দ ৫ শতাংশের নিচে রয়েছে বহু বছর ধরে। জিডিপির হিসেবে ১ শতাংশের কম ০.৯% যা দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার মধ্যে সর্ব নিম্ন। নিজের টাকায় চিকিৎসার খরচ নির্বাহ করার দিক থেকে বাংলাদেশের জনগণ সর্বোচ্চ খরচকারি। করোনায় কেন মানুষ টেস্ট করতে চায় না তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। একজনের টেস্ট করাতে সবমিলিয়ে ৫ হাজার টাকা এবং হয়রানির কথা এবং মাসিক আয়ের কথা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে তা স্পষ্ট হতে বাকি থাকবে না।

প্রবাসী আয়েও বড় ধাক্কা আসবে করোনারকালে। এর ফলে রেমিটেন্সও কমে যাবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রবাসী শ্রমিক যাওয়ার খরচ সবচেয়ে বেশি। সরকারের ভূমিকা নগণ্য, রিক্রুটিং এজেন্সির নামে মানব রপ্তানির ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া প্রভাব এখানে। প্রতিবছর গড়ে ৮ লাখ যুবক-যুবতী কাজের সন্ধানে দেশের বাইরে যেত সেটা তো কমবে সাথে সাথে ফিরে আসা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়বে। ১ কোটির বেশি প্রবাসী শ্রমিকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফেরৎ আসবে। সৌদি থেকেই ১০ লাখ। করোনা বিপর্যয় সামাল দিতে সরকার যে লক্ষাধিক কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তা খেয়াল করলে দেখা যাবে সামগ্রীক অর্থনীতির ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণের বিষয়গুলো সেখানে তেমন গুরুত্ব পায়নি, যতটা গুরুত্ব পেয়েছে বড় ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসা খাত।

প্যাকেজ ১ : ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা দেওয়া, ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণসুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংশ্লিষ্ট শিল্প বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেওয়া। এ ঋণসুবিধার সুদের হার হবে ৯ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ ঋণগ্রহীতা শিল্প বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ ২ : ক্ষুদ্র (কুটিরশিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান : ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণসুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেবে। এ ঋণসুবিধার সুদের হারও হবে ৯ শতাংশ। ঋণের ৪ শতাংশ সুদ ঋণগ্রহীতা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ ৩ : বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (ইডিএফ) সুবিধা বাড়ানো : বন্টক টু বন্টক এলসির আওতায় কাঁচামাল আমদানি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইডিএফের বর্তমান আকার ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে। ফলে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ইডিএফ তহবিলে যুক্ত হবে। ইডিএফের বর্তমান সুদের হার LIBOR + ১.৫ শতাংশ (যা প্রকৃত পক্ষে ২.৭৩ %) থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হবে।

প্যাকেজ ৪ : প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণসুবিধা চালু করবে। এ ঋণসুবিধার সুদের হার হবে ৭ শতাংশ।

প্যাকেজ ৫ : এর আগে রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি আপৎকালীন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

এই করোনায় দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে সবচেয়ে উপেক্ষিত খাত বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক। শুধু ভাতের সংস্থান করা নয়, সবজি, মাছ, ডিম, মুরগি, দুধ, মাংস, ফল কোন কিছুর-ই অভাব বোধ করতে দেয়নি যে খাত, গত বাজেটেও সবচেয়ে উপেক্ষিত ছিল কৃষি মাত্র ৩.৫ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছিল এই সব প্যাকেজের মধ্যে গার্মেন্টস শ্রমিকদের এপ্রিল মাস থেকে ৩ মাসের বেতন ভাতা পরিশোধের পরিকল্পনা ছিল। যদিও তার বাস্তবায়ন তেমন চোখে পড়েনি। কৃষি খাতেও ৫ হাজার কোটি টাকার যে প্যাকেজ ঘোষণা

করেছে, তাতে দেখা যায় রপ্তানি শিল্পে ঋণ প্রণোদনায় সুদ ২% অথচ কৃষি ঋণ প্রনোদনায় সুদ ৪%। তাছাড়া ৪ একর জমির মালিক ঋণ পাবে আড়াই লাখ টাকা অথচ কৃষি পণ্য ব্যবসায়ী পাবে ৫ কোটি টাকা। এ থেকে বুঝা যায় সরকারের অগ্রাধিকার কাদের দিকে।

এ পরিস্থিতিতে ১১ জুন ২০২০ আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট আসছে। বাজেট তো শুধু অর্থনীতির হিসেব নিকেশ নয় বাজেট একটি অর্থনৈতিক দর্শনও বটে। বাজেটে কে গুরুত্ব পাবে আর কে গুরুত্ব হারাবে তা নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা। বিগত বছরগুলোতে ঋণ খেলাপি, ব্যাংক ডাকাত, টাকা পাচারকারিরা সমস্ত ধরণের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে। এবারের বাজেটেও কি সেই ধারা অব্যাহত থাকবে? এ প্রশ্ন বাজেটের প্রাক্কালে খুবই সঙ্গত। ধারণা করা হচ্ছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার বেশি আকারের বাজেট হবে এ বছর।

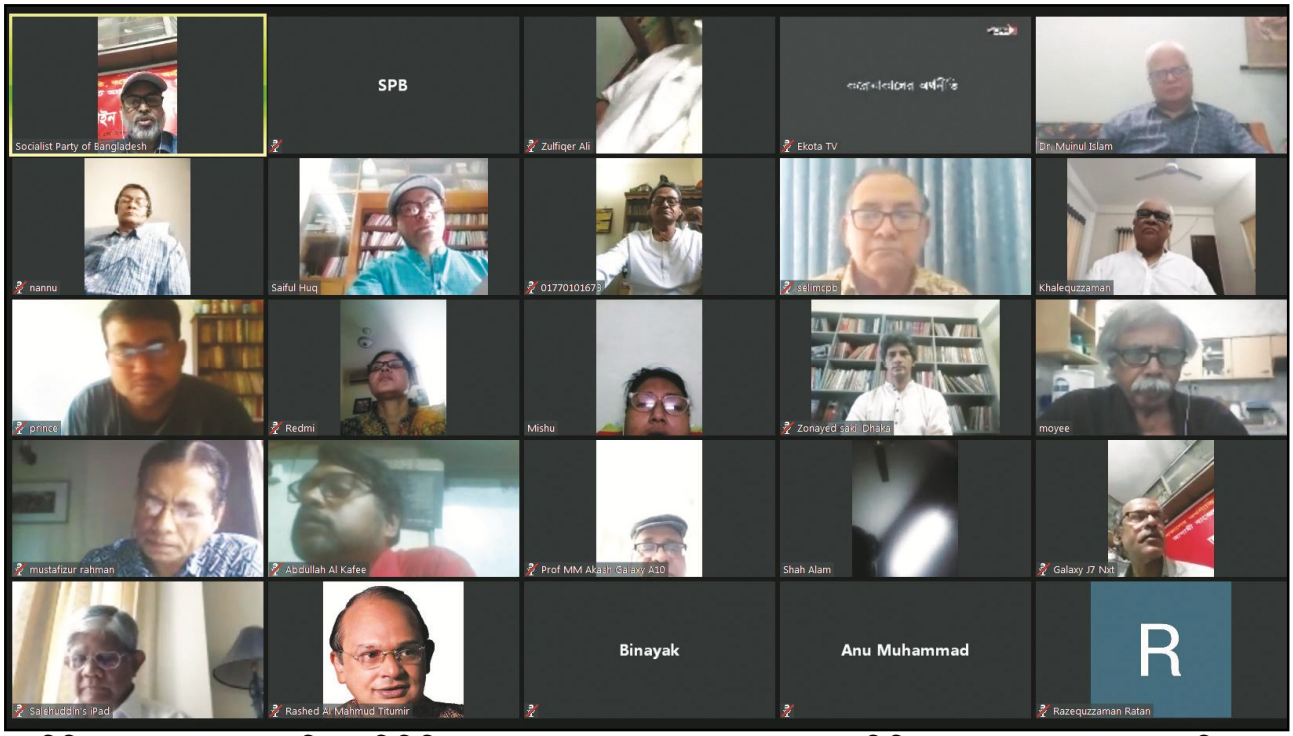

মতবিনিময় সভায় আরো যুক্ত ছিলেন সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম, প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ নেতা জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন, বাসদ মার্কসবাদী নেতা মানস নন্দী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা আকবর খান, গণসংহতি আন্দোলনের ফিরোজ আহম্মেদ।

মতবিনিময়সভার আলোচকদের বক্তব্য ঈষৎ সম্পাদনা করে উপস্থাপন করা হলো:

সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০২০-২১ সালের বাজেট গতানুগতিকতার বাইরে হতে হবে। বাজেট প্রণয়নের জন্য রিসোর্স কমিটি, অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ই.আর.ডি তারা একটা বাজেট বরাদ্দ মোটামুটি ঠিকঠাক করে রাখে বিগত বছরের ভিত্তিতে। এমন সরকারি অফিসের জন্যও বরাদ্দ থাকে যারা তেমন কোন কাজকর্ম করে না-যারা নিজেদের উপস্থিতি দেখানোর জন্য চেয়ারে ছাতা রেখে চলে যায়। আমাদের এখন গুরুত্বদিয়ে বিবেচনা করতে হবে কীভাবে অর্থনীতিকে সচল রাখতে পারবো। দেখতে হবে প্রবৃদ্ধি কোন খাতে আসছে আর কোন খাতের গুরুত্ব কেমন। জিডিপিতে কৃষির অবদান কম, তাই বলে সেখাতে বরাদ্দ দিবে না এই ধরনের চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাজেটে এবার যে খাত গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ সেটা হলো স্বাস্থ্য। আরেকটা বিষয় দেখতে হবে আমাদের দেশের গরিব মানুষদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের দিকটা। করোনা কালে অনেকে দারিদ্র সীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। আমাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে যে সেক্টরগুলো বেশি ভূমিকা রাখছে তাদের জন্য প্রণোদনা দিয়ে যাব, যারা বৈদেশি মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখছে তাদের দিব কিন্তু মনে রাখতে হবে বৈষম্যের দিকটা।

তিনি আরও বলেন, এক বছরের বাজেটে সবকিছু করা যাবে না। অনেকে অনেক কথা বলবে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আইটি শিক্ষা এগুলোর ওপর নজর দিতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো কৃষি খাতের ভর্তুকি। অনেক সময় এই ভর্তুকির সুবিধা কৃষকরা পায় না। কৃষি ঋণ যেটা দেয়া হয় সেটা পেতে কৃষককে হয়রানি হতে হয়। কারণ ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে যে ঋণ দেয়া হয়, সেখানে দালালের আনাগোনা আছে এই কারণে তাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়, আর তার পরিমাণও যথেষ্ঠ নয়। কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যা আছে, কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পায় না। সরকার ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ধান তো সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনে নিতে পারতো।

স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দ জিডিপির দশমিক ৮ শতাংশ অন্যান্য দেশে ৩ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের মাত্র ৫% বরাদ্দ। তারা বলে বরাদ্দ ব্যবহার করতে পারে না। বরাদ্দ ব্যবহারের জন্য তো ভালো পরিকল্পনা ও মনিটরিং লাগবে, দক্ষ ব্যবস্থাপক লাগবে। বরাদ্দ ব্যবহার করা যায় না বলে কী স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দিবেন না। পকিস্তান

আমলেও বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান বরাদ্দকৃত টাকা যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। এই ধরনের কথা এখন আবার চালু হয়েছে। কাজেই স্বাস্থ্য খাতটাকে ঢেলে সাজাতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে উন্নত করতে হবে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ না বাড়ালে আমরা দক্ষ জনশক্তি পাব না। ভবিষ্যতে বিদেশে অদক্ষ শ্রমিক যেতে পারবে না। অদক্ষ যে জনশক্তি বিদেশে আছে তারা ফিরেও চলে আসতে পারে। আমাদের যারা প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে তাদের সামাজিক সুরক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য বিমা চালু করা যেতে পারে ধাপে ধাপে। এবছর যেহেতু অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর এটা এই বছরই শুরু হতে পারে। সামাজিক সুরক্ষা খাতের বাজেটের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন খাতে, গ্রাচ্যুইটি ফান্ডে। তাই সাধারণ মানুষ এখান থেকে তেমন কোন সুবিধা পায় না। এখানে অনেক ধরনের ফাঁকিঝুঁকি আছে। সরকারি চাকরিজীবীদের যে প্রণোদনা দেয়া হয় সেটা আর বাড়ানো যাবে না। এখন যে প্রণোদনা প্যাকেজ দেয়া হয়েছে সেটা ব্যাংক ঋণ নির্ভর। ব্যাংকের ওপর নির্ভর করে থাকলে এই প্যাকেজ কীভাবে বাস্তবায়ন করবে আমি সেটা বুঝতে পারছি না। এটা কঠিন হবে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে আমাদের বাজেট বরাদ্দ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। আবার এডিপিতে নতুন করে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এখানে বরাদ্দ না দিয়ে তো সে টাকা করোনাকালে চিকিৎসায় ব্যয় করা যেত। আমাদের কিছু বড় বড় প্রকল্প আছে যা এখন বন্ধ থাকতে পারে। যেমন, রূপপুর পাওয়ার প্লান্টপ্রজেক্ট। কারণ আমাদের যা বিদ্যুৎ প্রয়োজন তার চেয়ে তো বেশি উৎপাদনের সক্ষমতা আছে। এমন অনেকগুলো প্রকল্প আছে যেগুলোতে এখন খরচ না করে টাকা বাঁচানো যাবে। সরকারের অপচয় এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর দিকে খেয়াল করতে হবে। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। ট্যাক্সের পরিমাণ কমাতে হবে। যাদের ট্যাক্স দেয়ার সামর্থ্য আছে কিন্তু ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারছে না, তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করতে হবে। আবার ট্যাক্স লিকেজ হয়। আমরা ট্যাক্স দিলাম কিন্তু সেটা সরকারের কোষাগারে জমা হচ্ছে না। এনবিআরকে এই কাজটা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে হবে। মনিটরিং পলিসি এবং ফিস্কেল পলিসিটা এমনভাবে করতে হবে জনগণ যাতে সরাসরি উপকৃত হয়। আর এসবে যদি স্বচ্ছাতা ও জবাবদিহীতা না থাকে তা হলে জনগণ উপকৃত হবে না।

উপজেলা পর্যায়ে অনেক হাসপাতাল আছে যেখানে অনেক যন্ত্রপাতি আছে কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার হচ্ছে না। জনগণ সেখান থেকে উপকৃত হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে কিন্তু প্যাকেটও খোলা হয়নি তেমনি পড়ে আছে। কারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার দক্ষ জনবল নেই। দুর্নীতি রোধ করতে হবে। সরকারের একার পক্ষে কিন্তু এই দুর্যোগ থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। এখানে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন আছে। যত ধরনের সামাজিক শক্তি আছে সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। উন্নয়নকে বিকেন্দ্রিকরণ করতে হবে। ঢাকা থেকে সবনিয়ন্ত্রণ করবে এটা ঠিক হবে না। সরকারের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব ব্যয় দুটোকেই যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। এখন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে স্বল্প সুদেও কিছু টাকা আনা যেতে পারে। এই যে আমরা যারা কথা বলছি আমাদের কথা সরকারের শুনা উচিৎ। মানুষের কথা না শুনলে মানুষ যুক্ত হবে না আর বাজেটের বাস্তবায়নও যথাযথ হবে না।

অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম বলেন, প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন বাংলাদেশের অর্থনীতি একটা গিরিখাদে পড়ে গেছে। আগামী বাজেট এবং অর্থবছরটা হবে গিরিখাদ থেকে আবার উন্নয়নের মহাসড়কে ফিরে আসার প্রয়াস। এক বছরে হয়তো ফিরে আসা সম্ভব হবে না। খেয়াল রাখতে হবে যে করোনাভাইরাস মহামারি এটা প্রমাণ করে দিয়েছে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য খাতটা প্রচণ্ডভাবে অবহেলিত এবং অকিঞ্চতকর অবস্থায় আছে এবং আমরা একটা মুক্তবাজার অর্থনীতির আফিম গিলে যেভাবে স্বাস্থ্য খাতকে বাজারিকরণে নিয়ে গেছি তাতে প্রমাণ হয়ে গেছে বেসরকারি হাসপাতালগুলো এই ধরণের ইমার্জেন্সি এবং জনস্বাস্থ্য খাতে অবদান রাখার জন্য তাদের ইচ্ছার অভাব রয়েছে। তাদের প্রস্তুতির অভাব রয়েছে এবং তাদের অগ্রাধিকারের বিষয় এটা নয়। আমাদের সামনে এই প্রশ্নটার মিমাংসা হয়ে গেছে যে, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা যারা বাস্তবায়ন করেছে–কেরালার উদাহরণটা বার বার আমরা দিয়েছি ভারতের মধ্যে কেরালা সবচেয়ে ভালভাবে করোনাভাইরাস মহামারি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে এবং সেখানকার মৃত্যুর হার ০.৫৩ শতাংশ। আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আমূলভাবে বদলে ফেলার জন্য কেরালা অনুকরণীয় মডেল হিসেবে থাকবে। কেরালার মডেলটা কিন্তু আবার কিউবার আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে প্রচণ্ড রকমের অগ্রাধিকারের প্রশ্ন রয়েছে। আমরা যে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে রয়েছি তা স্বাস্থ্যখাতে কাজ করে না। আমাদের ১৭ কোটি মানুষের জন্য কেরালার মডেল যেন হয়, এইটা যেন আমাদের আগামী বাজেটে প্রতিফলিত হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতার আসার পর থেকে আমাদের জিডিপি শতাংশ হিসেবে ১ শতাংশের নিচে বারবার রয়ে গেছে; যেটা এরশাদের আমলে ০.৪৫ শতাশে নেমে গিয়েছিল সেটা সামান্য বেড়ে .৮৫ মাত্রায় চলে যায়! আমাদের সরকারি যেসব হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে সেগুলি সবই প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। এগুলো নিম্নবিত্ত মানুষের মৃত্যু ত্বরান্বিত করার কারখানায় পরিনত হয়েছে, এগুলো আরোগ্য নিকেতন নেই। এখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আমি জানি না বর্তমান সরকারের বাজেট সেটা মুক্তবাজার অর্থনীতিকে আকড়ে ধরে রয়েছেন তাদের অগ্রাধিকারে প্রতিফলিত হবে কি না। হয়তো এ দাবিতে জনগনকে সাথে নিয়ে আমাদের আন্দোলন, সংগ্রাম গড়ে তুলতে হতে পারে যে, স্বাস্থ্য খাতে মুক্তবাজার অর্থনীতি চলবে না, মুক্তবাজার অর্থনীতি পরিত্যাগ করতে হবে।

জনগণকে সরকারি সহযোগিতার জন্য ভারতের যে আধার কার্ড এর আদলে কোন ব্যবস্থায় না যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে আমি জানি না। আমরা যদি আধার কার্ড এর মতো একটা কিছু গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে আমাদের রেশনের টাকা মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তদের দখলে যাবে, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান-মেম্বারদের পকেটে, তাদের আত্মীয়–স্বজনের পকেটে চলে যাবে। আমরা কেন নিয়ম

পদ্ধতি সংশোধন করতে পারছি না এটা নিয়ে আমার প্রচণ্ড রকম ক্ষোভ আছে। সহযোগিতাগুলো যথা স্থানে যাচ্ছে না। করোনাভাইরাস মহামারির অর্থনীতির দুইটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক আছে একটি হলো রপ্তানি খাত, সেখানে এক তৃতীয়াংশ রপ্তানি কমে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে, আর একটা হল রেমিট্যান্স তাও এক তৃতীয়াংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তারচেয়ে বড় আশঙ্কা ও বিপজ্জনক হলো কয়েক লাখ শ্রমিক যারা দেশে ফেরত আসবে এর যে অর্থনৈতিক অভিঘাত সেটা প্রচণ্ড রকম ভয়ঙ্কর অবস্থায় চলে যাবে। সেটা আগামী বছর বুঝা যাবে যখন পরিবহন সচল হবে তখন। এখানে খেয়াল রাখতে হবে অমাদের বাণিজ্য ঘাটতি থাকে প্রায় ১৫-২০ বিলিয়ন ডলারের সেটা কিন্তু রেমিট্যান্স দিয়ে পূরণ করা হয়। এই ঘাটতিটা যেহেতু বেড়ে যাবে সেজন্য আমাদের আমদানি নীতিতে যদি গতানুগতিকভাবেই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গ্রহণ করা হয় তা হলে সমস্যায় পড়ব। সেখানে একটা নিয়ন্ত্রণে যেতে হবে। আমাদের দেশে কেন ১৫ হাজার সিসির বেশি গাড়ি আসবে? এখানে এসি এবং অন্যান্য ইলেকট্রোনিক পণ্যের ওপর কেন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবো না?

ব্যয় সংকোচনের জন্য এক-দুই বছর সয়াবিন তেল খাব না, পাম ওয়েল দিয়ে কাজ চালিয়ে নিব। আমারা যে স্যানিটারি ফিটিংস এবং ইলিকট্রিক অন্যান্য জিনিস, আমদানি করি সেখানে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আনা দরকার তাতে ৪-৫ বিলিয়ন খরচ বাঁচবে। এসব বিলাসি পণ্য আমদানি বাদ দিতে হবে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখানে যতগুলো স্টেপ নেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে তার সবগুলোই প্রায় ব্যাংকিং খাত নির্ভর। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ব্যাংকিং খাতের আমানতে বিশাল ভাটার টান যখন দেখা দিবে–রেমিট্যান্স সেটা ফর্মাল চ্যানেলে আসুক অথবা হুন্ডির মাধ্যমেই আসুক শেষ পর্যন্ত রেমিট্যান্স কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরে আমানতের প্রবাহকে ঠিক রাখায় একটা ভালো অবদান রাখে। যার জন্য ৬০টি ব্যাংক করে এখন পর্যন্ত তেমন কোন ঘাটতিতে পড়িনি সেখানে এই রেমিট্যান্সের একটা ভাল ভূমিকা আছে। আগামী বছর কিন্তু রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ থাকবে না। অতএব আমাদের খেলাপি ঋণের রাঘব বোয়াল এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত তাদের কাছে যে আমাদের ব্যাংকিং খাতকে জিম্মি করে ফেলেছি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আমরা দেখছি যারা পুঁজি পাচার করছে, তারা ইতিমধ্যে বিদেশে ঘরবাড়ি করেছে, সব যখন বন্ধ তারা সরকারের অনুমতি নিয়ে প্লেন ভাড়া করে তাদের পরিবার নিয়ে ভেগেগেল। তারা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মালয়েশিয়ায় পুঁজি পাচার করছে তাদের ঠেকানো হয়নি। যারা খেলাপি হয়েছে তারা ২% ঋণের টাকা দিলে তাদের ৫-১০ বছর ফ্রি করে দেয়া হচ্ছে এই ধরণের মনোবৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বালাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর আরও বড় ধরণের সমস্যার দিকে যাচ্ছে। এখানে ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে যেগুলি দুর্বল ব্যাংক সেগুলি ১-২ বছরের মধ্যে অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। এখন ব্যাংকিং মার্জারের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করার সময় আসছে, না হলে সরকারের এই প্রনোদনা প্যাকেজগুলো দেয়ার মতো ক্ষমতা ব্যাংকিং সেক্টরের থাকবে না সেখানে আমরা বড় ধরণের সংকটে পড়ে যাব।

আমরা একটা দ্বিধায় আছি নগদ অর্থ সাহায্য দিব নাকি সর্বজনীন খাদ্য বিতরণে যাব এটা নিয়ে নানা ধরণের বিতর্ক রয়েছে। আমরা এখন যে অবস্থায় আছি সেখানে টার্গেট গ্রুপগুলো থেকে যদি আত্মীয়স্বজনকে বের করতে চাই তাহলে কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং সুন্দর একটা ব্যবস্থা এনে দিবে। কেরালা কিন্তু এখন কৃষকদের জন্য পেনশন চালু করেছে, সেখানকার স্বাস্থ্য সুবিধা শতভাগ মানুষ পাচ্ছে। আমি মনে করি আগামী বাজেটে যদি কেরালার ভালো দিকগুলো প্রতিফলিত হয়, তাহলে বর্তমান সরকারের মুক্তবাজার অর্থনীতির আফিমের মৌচাকে মশগুল থাকার যে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসবে এইটা কামনা করি।

এম এম আকাশ বলেন, করোনার কারণে যে সমস্যাগুলো আমাদের সামনে এসেছে এবং যেটা ফোকাসে নিয়ে আমাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে আগামী বাজেটে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে পুরো সরবরাহ প্রক্রিয়া ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, মার্কেট চেইন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কিছু ই-মার্কেটিং এর মাধ্যমে চেষ্টা হচ্ছে। তার মানে আমাদের সমগ্র সামষ্টিক অর্থনীতিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে চলতি অর্থবছরে। যদিও অর্থবছরের ৮-৯ মাস স্বাভাবিকভাবে চলেছিলো। গত তিন মাস, অর্থাৎ মার্চ, এপ্রিল ও মে এই সময়ে ছিলো পড়তির দিকে। সুতরাং প্রথমে একটা ধারণা করতে হবে, আমাদের যেই সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির হার ছিলো তা কতটুকু কমবে। তা আমাদের ধারণা হলো যে ৬-৭ % অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমরা দেখতাম, সেখানে কেউ বলে ৪% এ নেমে আসবে কেউ বলে ২ % এ নেমে আসবে। ধরা যাক ৩% এ নেমে আসবে। তো ৩% প্রবৃদ্ধির হার এর পটভূমিতে আমরা বাজেট তৈরি করছি। এই যে ৩% প্রবৃদ্ধি এ নেমে আসবে, পরের বছর কত প্রবৃদ্ধি হার এ আমরা আনতে চাই। এখন হায়দার আলী খান সামাজিক হিসাবের সূচকের ভিত্তিতে বলেছেন যে, আমরা ৫% প্রবৃদ্ধি হারে আমরা আনতে পারি। যদি ৫% আমরা ধরে নিই, এটাই যদি প্রত্যাশিত হয় তাহলে আমাদের সেই অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেট তৈরি করতে হবে এবং সেটার সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। এবং সেটা কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে হবে। আপনারা বলেছেন আমাদের যে ৪টি উৎপাদনশীল খাত যার মধ্যে একটি হলো প্রবাসী শ্রমিক, সেটি উল্টোমুখী। মানে আরও লোক সেখান থেকে ফিরে আসবে। তবে আমরা এবার ঈদের সময় যে বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে আগের বছর ঈদের সময় যে বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি। সুতরাং এখনো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আতঙ্কজনক অবস্থায় যায়নি। ৩৩ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে আছে। এখন পর্যন্ত ভিত্তি হিসেবে আমরা যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আছি। আর যে ১০ লাখ শ্রমিক ফিরে আসবে তারা দক্ষ হবে এবং তাদেরকে যদি আমরা ঠিকমতো কাজের সুযোগ দিতে পারি তাহলে হয়তো সংকটটা কমবে। আর আপনারা বলেছেন কৃষিতে এবার আমাদের সৌভাগ্য যে ধানের উৎপাদন ভালোই হয়েছে। কাটাকাটি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যা আছে, আমাদের কৃষককে আমরা প্রণোদনা না দিলেও কৃষক আমাদের দিয়ে যাচ্ছে। সে কারণে দুর্ভিক্ষের

আশঙ্কার তেমন নেই। তাহলে দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল আমাদের আছে তাই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও নেই। কিন্তু যে লোকগুলো গার্মেন্টস খাতে আছে তাদের ব্যাপক সমস্যা হবে। ব্যাপক সমস্যা এই অর্থে যেগুলো সাব কন্ট্রাকটিং ছোট কারখানা সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তো বন্ধ হয়ে গেলে কত শতাংশ বন্ধ হবে অথবা কমে যাবে। শুধু বন্ধ হয়ে যাবে এমন না—সক্ষমতা কমবে, বেকার তৈরি হবে। আমরা যদি ১০% ও ধরি, তাহলেও চার লাখ কিন্তু চাকরি হারাচ্ছে। সে সমস্যটা আগামীতে সামনে আসবে। মোটের ওপর আমাদের গার্মেন্টসএর বর্তমান যা অবস্থা তার সেটা পরিচালনা করার সক্ষমতা নেই। এমনকি সরকার যে টাকাটা দিয়েছিলো সে টাকাও তারা ঠিকমতো ব্যাবহার করতে পারেনি। এমনকি চালু করার ক্ষেত্রেও তারা একটা বিচ্ছিরি অবস্থার সৃষ্টি করে মহামারিকে আরো ত্বরান্বিত করে তুলেছে। সুতরাং আমি মনে করি বাম জোটের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এবং সেটার জন্য একটা দাবি হতে পারে যে, মনিটরিং করে যে কারখানাগুলো আসলেই বন্ধ হয়ে যাবে, যাদের পুঁজি নাই এবং যাদের অর্ডার নাই তাদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথমত, ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই দাবি তোলা উচিত বলে আমি মনে করি যে, কোন শ্রমিককে এই সময় ছাঁটাই করা যাবে না। কাজের নিরাপত্তা এবং সবার করোনা পরীক্ষা করতে হবে। এবং তাকে কাজে লাগালে স্বাস্থের নিরাপত্তাটুকু দিতে হবে। কীভাবে কাজের এবং স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দেয়া যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করে বাম জোটকে সরকারের উপর চাপ দিতে হবে। আরেকটা কাজ সরকার করেছে, সেটা হলো পুরো প্রণোদনা প্যাকেজটাকে ব্যাংকের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ব্যাংক খাতে যে অনিয়মের রাজত্ব চলছে সেটার চরিত্র হলো লুটেরা। টাকা লুট করতে এসে টাকা না পেয়ে ম্যানেজারকে তুলে নিয়ে গুলি করেছে। যারা গুলি করলো সরকার তাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল। সুতরাং এই লুটেরাদের আধিপত্যের মধ্যে ব্যাংক খাতের পক্ষে এই প্যাকেজ কার্যকরী করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি না। টাকাগুলি পৌঁছানোর পর যাতে ঠিকমতো ব্যবহৃত হয়। এবং সেখানে যাতে আবার ঋণখেলাপি এবং আবার লুটপাটের মধ্যে না যায়। ব্যাংক খাত সম্পর্কে কী বলছে আগামী বাজেট তা আমাদের নিবিড় মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আগামী বাজেটে কৃষির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ স্থানীয় বাজার এবং স্থানীয় খাত হিসেবে কৃষির উপরেই ভিত্তি করে আমরা যতটুকু পারি বাঁচবো। ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি প্রতিষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এখানে যে টাকাটা দেয়া হয়েছে সে টাকাটা যাতে সঠিক লোকের হাতে যায় এবং যার প্রয়োজন। যে শ্রমিকরা গ্রামে গিয়েছিলো তাদের কেউ কেউ যাতে সেখানে কাজ শুরু করতে পারে সেরকম একটা ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। না করলে পরে যখন তারা আবার শহরের দিকে আসবে তখন একটা মহামারি হবে। এবং মহামারি বাড়ার পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নানা রকম সমস্যা হতে পারে। আমি আরেকটা বিষয় বলবো যে কৃষির বাজেট যাতে দ্বিগুণ করা হয়। স্বাস্থের বাজেট যাতে দ্বিগুণ করা হয়। স্বাস্থের বাজেট ছিলো ২৫ হাজার কোটি টাকা, এটা এখন ৫০ হাজার কোটি টাকা করতে হবে। আর কৃষির বাজেট যেটা ছিলো সেটাতো আপনারা জানেনই। এর অবদান হচ্ছে জিডিপির ১৪%, অন্তত ১০-১২% বাজেট তো একে দিতেই হবে। কিন্তু সেটা তো সরকার দিচ্ছে না। আমি আপাতত এইটুকু বলে শেষ করছি।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাম জোটের এই আয়োজনে একটা অর্থনৈতিক ও একটা রাজনীতি আছে। কোভিড-১৯ এর আমরা যে প্রবণতাগুলো দেখছি এর কার্যকারণ এবং সমাধানের যে পদ্ধতি দেখছি এর একটা শ্রেণি চরিত্র আছে। এতে যারা বেশি মারা যাচ্ছে তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর। আমরা আমেরিকায় দেখছি কৃষ্ণাঙ্গরা বেশি মারা যাচ্ছে। এতে সংক্রমিত বেশি হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। বিশ্বের ৮৪টা দেশ করোনাভাইরাসের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। তারা রপ্তানি ব্যান্ড করেছে, খাদ্র সামগ্রির বিষয়ে, চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ওপর। এগুলো আমাদের ভিন্ন ধরণের চিন্তার খোরাক দেয়, বিকল্পভাবে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা আমরা ভাবতে কী পারি। গত ১০ বছর ধরে আমাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়ছে কিন্তু আঘাত সহ্য করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। সহনশীলতার ক্ষমতা যে কত দুর্বল সেটা আমরা দেখলাম। আমাদের ওপর যখন অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত ও মানবিক আঘাত আসলো তখন সে বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়লো। আমাদের প্রণোদনা যে প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে সেটা ব্যাংক নির্ভর। প্রান্তিক পর্যায়ের ৫০ লাখ মানুষের জন্য ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। যে ব্যাংক কোভিড আসার আগেই দুর্বল অবস্থায় পড়েছিল তাদের দিতে হবে ১ লক্ষ কোটি টাকা। একটা দুর্বল অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের বিপর্যয়কে সামাল দিতে হচ্ছে।

আমাদের একটা সার্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থার দাবি জোরালোভাবে তুলি না কেন, যা এই বাজেট থেকেই শুরু হতে পারে। এখানে টাকা কত বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, কত শতাংশ বরাদ্দ হলো তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সাথে সাথে ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন আসতে পারে যদি আমরা স্বাস্থ্য-শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ দ্বিগুণ করি তা হলে কমাবো কোথায়? বলা হচ্ছে আমরা অপ্রদর্শিত আয়কে এবার নিব। এখানে কর খেলাপি আছে, ঋণ খেলাপি আছে তাদের ধরতে হবে, দেশের টাকা পাচার হয়ে বিদেশে চলে গেছে। তাদের ঠেকানো গেলো না। এখন নগদ টাকা নেই, তাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। আমরা বলছি ৮ হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা ২ মাস দেয়ার জন্য। ১৭ মিলিয়ন মানুষকে দিতে গেলে ২৬ হাজার কোটি টাকা লাগবে যা জিডিপির ১%। আমাদের রেমিটেন্স কমে যাবে, অনেক শ্রমিককে চলে আসতে হবে। কারণ সৌদি আরবসহ ওই সমস্ত দেশ যে নীতি নিয়েছে বিমান চালু হলে অনেককে পাঠিয়ে

দিবে। নিয়মিতভাবে যারা দেশের শ্রম বাজারে আসে তারা তো আসবেই নতুন করে যারা বিদেশে ছিল তারও এসে যুক্ত হবে। এর জন্য আমাদের একটা নীতি নির্ধারণ করতে হবে। এটা ঠিক যে, কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে, আমরা কি শ্রমঘন শিল্পের যন্ত্রপাতির

আমদানির ওপর অনেক ট্যাক্স বসাব, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রম বাজারটাকে ঠিক রাখাই হলো আমাদের দারিদ্র নিরসনের কার্যকর উপায়। আমাদের কর্মসংস্থানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে আলোচকদের আলোচনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং বিশ্লেষণ এসছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এসছে সেটা বর্তমান অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদের এবং দীর্ঘমেয়াদী সংকট দূর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এসব প্রস্তাব কে শুনবে সেটা গুরুত্বপূণ। বর্তমান সরকার নাগরিকদের পক্ষ থেকে বা সরকারের বাইরে থেকে আশা কোন প্রস্তাব শোনার জন্য অপেক্ষা করছে বা শুনতে চায় এরকম কোন লক্ষণ আমরা দেখি না। ৮ মার্চ যখন প্রথম করোনা ধরা পড়ে বাংলাদেশে, তারপর থেকে নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সুপারিশ সরকারের কাছে করা হয়েছে–কী করা উচিত, কি ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করা উচিত, চিকিৎসা ক্ষেত্রে কী ধরণের আশু পরিবর্তন দরকার, সরকারের ভূমিকা কী হওয়া দরকার, লকডাউন নিয়ে কী করা দরকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে অসংখ্য প্রস্তাব সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে, সরকার এগুলো কোন বিবেচনায় নিয়েছে বলে মনে হয় না। এমনকি সরকার নিজের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির কথাও কানে নিচ্ছে বলে মনে হয় না। কারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কীভাবে সিদ্ধান্ত সিচ্ছে, সেটা একটা বড় অনুসন্ধানের বিষয়।

সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, সেগুলোর নিজস্ব কোন কার্যক্রমের পরিকল্পনা নাই—যারাই যা কিছু করেন, শুধু প্রধানমন্ত্রির নির্দেশেই করেন বলে শুনা যায়। সে নির্দেশও ঠিক মতো কাজ করছে না যেমন, প্রধানমন্ত্রি নির্দেশ দিয়েছেন ত্রাণ বিতরণ করতে হবে ঠিকমতো কিন্তু সেখানে দুর্নীতি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রির নির্দেশ শুনতে পাচ্ছি যে যেখানেই দুর্নীতি হোক, তাকে দমন করা হবে, দেখা যাচ্ছে যে দুর্নীতিবাজ যারা, এমন কি ব্যাংক লুট করে ব্যাংকের এমডিকে গুলি করতে চাইলেও, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই তারা বিদেশ চলে যাচ্ছে। বড় বড় ঋণখেলাপি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই লক ডাউনের মধ্যে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের প্রস্তাব, সুপারিশ, বিশ্লেষণ, সেটা সরকার শুনবে, এমন প্রত্যাশা করা খুব কঠিন। কিন্তু তারপরেও কথাগুলো বলতে হবে এই কারণে যে, সমাধাণের যে পথ আছে অন্যান্য বহু দেশ সেই দৃষ্টান্ত রেখেছে। করোনাকালের অভিজ্ঞতা তো সব দেশেরই হচ্ছে। কোন দেশের মানুষ বেশি আক্রান্ত, ভোগান্তি ও মৃত্যুর শিকার হচ্ছে বেশি আবার কোন দেশে কম হচ্ছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা শর্ত যেসমস্ত দেশ পূরণ করেছে–যেমন, যারা কাণ্ডজ্ঞান এবং দায়িত্বজ্ঞানের সাথে যথাযথ ভূমিকা পালন করে প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যে সমস্ত দেশে সামাজিক নিরাপত্তা মানে সকল নাগরিকের জন্য ন্যূনতম নিরাপত্তা এবং তার নিশ্চয়তার বিধান করা। আর তৃতীয়ত হচ্ছে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা। এই ৩টা জিনিস যে দেশে যে মাত্রায় আছে, সেই দেশে সেই মাত্রায় নাগরিক দুর্ভোগ ও ভোগান্তি কম হচ্ছে। আমরা মনে করি সসামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, এই দুইটা বর্তমান বাংলাদেশে সরকারকে একক দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। কারণ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সরকার এটা ধ্বংস করেছে, বা কখনও দাঁড় করায়ই নাই। আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় যে শান-শওকত দেখতে পাচ্ছি, বিশাল বিশাল ৫ তলা হোটেলের মতো হাসপাতাল এবং দামি দামি নানারকম জিনিসপত্র, সেই সমস্ত ব্যবস্থা যে কাজের না, এই করোনার সময় সেটা বোঝা যাচ্ছে আর এটা সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার বিপরীতেই হয়েছে।

ইউনাইটেড খুব দামি হাসপাতাল, সেখানে নানারকম থাকা খাওয়ার বেশ ভালো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেখানে করোনার জন্য যে ব্যবস্থা সেটা কিরকম দায়িত্বহীন, অবহেলার সাথে করা হয়েছিল সেটার প্রমাণ পাওয়া গেছে যখন সেখানে ৮ জন রোগী মারা গেল।

প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর সমিতি আছে, সে সমিতির সেক্রেটারি হচ্ছেন বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণমন্ত্রী। ত্রাণমন্ত্রী টেলিভিশনে বললেন যে, প্রাইভেট হাসপাতালগুলো করোনার জন্য সব কাজ করবে। পরে দেখা গেল কোন কাজ হচ্ছে না, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেও কোন কাজ হল না। প্রাইভেট হাসপাতাল কেন কাজ করছে না? কারণ এখানে তো তারা মুনাফার সন্ধান পাচ্ছে না। যেহেতু মুনাফার সন্ধান পাচ্ছে না, তাই তারা এখান থেকে পুরোপুরিভাবে সরে গেছে।

করোনাকালে একটা বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী, দারিদ্র সীমার নিচে নেমে গেছে, সরকারি হিসেবেই প্রায় ৪ কোটি মানুষ। সরকারের হিসেবটাই তেমন গ্রহণযোগ্য না কিন্তু তারপরও সেই হিসেবে যারা প্রান্তিক অবস্থায় ছিলেন, তারাও এখন দারিদ্রের মধ্যে পড়ে। তাই ৮ কোটি মানুষ এখন দরিদ্রসীমার নিচে। কর্মসংস্থান হারানোর ফলে যারা খাদ্য সংকটে ভুগছেন তাদের হিসেবে আনলে আমরা পাবো প্রায় ১২ কোটি মানুষ। এটা কেন হচ্ছে? কারণ এখানে কোন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাই।

করোনা সংকটে সরকারের ঘোষিত প্যাকেজের অগ্রাধিকারে জনগণ নাই, তারা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মানে জনগণের প্রয়োজন, স্বার্থ সম্পর্কে এতটা নির্লিপ্ত এতটা নিষ্ঠুর সরকার আমি পৃথিবীতে খুব কম দেশে দেখতে পাচ্ছি। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত যে দেশগুলোতে ফ্যাসিবাদী সরকার আছে, সেই দেশের প্যাকেজগুলোতেও জনগণের খাদ্য জোগান দেওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্যাকেজই হলো যাদের হাতে সম্পদ আছে, সুযোগ-সুবিধা আছে, তাদেরকে রাষ্ট্র সবসময়ই সুবিধা দিয়েছে। সেই মালিকদের জন্য যারা ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নিতে পারে এবং ঋণ খেলাপি হতে চায় তাদের জন্য আরও সুবিধা দেওয়া। প্রথমে প্রায় ৭০ হাজার পরে বাড়িয়ে প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা মতো দেওয়া হয়েছে। আর ৪ বা ৮ কোটি মানুষের জন্য যে খাদ্য দেওয়া হয়েছে সেটার পরিমাণ যদি টাকায় হিসাব করি–খাদ্য, শিশু খাদ্য ইত্যাদি ধরলে আসে ৭০০ কোটি টাকার মতো পরে নগদ ২ হাজার ৫০০ হাজার টাকা করে ৫০ লাখ মানুষের জন্য মোট ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকার মতো। তারমানে যারা অনাহার,

কর্মহীন এবং সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য সরকার বরাদ্দ করেছে ২ হাজার কোটি টাকা। বাকি ৮০-৯০ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে, যারা ইতিমধ্যেই সরকারের নানান সুবিধা পেয়েছে তাদের জন্য। ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কারণ সরকার বলছে টাকা নাই। আমরা জানি গত বছর বিদ্যুৎকেন্দ্র অলস বসিয়ে তাদের পেছনে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা। খেলাপি ঋণ, হাজার লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে সেগুলো তো আছেই। তার মানে অগ্রাধিকারের মধ্যে জনগণ নাই। এইরকম পরিস্থিতিতে বাজেট হচ্ছে। সরকার যদি চিন্তা করতো করোনা আসার পর সারা পৃথিবীতে একটা পরিবর্তনের বার্তা শোনা যাচ্ছে। যেভাবে উন্নয়ন, বরাদ্দ, জিডিপি প্রবৃদ্ধি মাপা হচ্ছে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে দেখা হচ্ছে, শিক্ষাকে যেভাবে দেখা হচ্ছে, যেভাবে লুটপাট নির্ভর অর্থনীতি চলছে, সেটা চলবে না। এগুলোয় কিন্তু করোনার সময় একটা বিশেষ মনযোগ আসছে, বিশেষ বার্তা আসছে। বাংলাদেশ সরকারের এসব বার্তা গ্রহণ করার মতো কোন আগ্রহ, চেষ্টা বা মাথায় প্রশ্ন আসছে সেটার কোন লক্ষণই আমরা দেখি না। সেটা দেখলে আমরা দেখতে পেতাম বাজেটেও সেরকম একটা পরিবর্তন হতো। আমি যেটা মনে করি, বর্তমানে বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি একটি সংকটময় নাজুক পরিস্থিতিতে আছে।

আলোচকরাও বলেছেন, যেহেতু রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয় বাংলাদেশের বর্তমান ধারার অর্থনীতির একটা বড় ভিত্তি; বৈশ্বিক সংকটটা এখন সরাসরি আমাদের ওপর পড়বে। অবহেলিত কৃষিকে বাঁচিয়ে রেখে পুরো জিনিসটা পুনর্বিন্যাস করার জন্য বাজেটে একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তুলে ধরাই হতো যৌক্তিক। বর্তমান সময়ে ঠিকভাবে কাজ করতে গেলে বাজেট ঘোষণা থেকে সরকারের সম্পূর্ণ বিরত থাকা উচিত। আর বছরের বাকি যে কয়টা মাস সেটা দুর্যোগকালীন বা অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থায় চলতে পারতো।

অর্থবছরের পরিবর্তন হওয়া দরকার, যে কথা আমি আগেও বলেছি। সেটা আগামী বছর থেকে শুরু করা উচিত। অর্থাৎ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিলের দিকে বাজেট নতুন করে শুরু হবে এবং সেটা হবে জনগণের খাদ্য ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা এক নাম্বার, আর দুই নাম্বার হলো বিপর্যস্ত যে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা। এই দুটোকে অগ্রাধিকার দিয়ে। সেটা করার জন্য এই বাকি কয়টা মাসে বরাদ্দটা দিতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যথারীতি প্রতিবছর যা হয় এই বছরও তা হয়েছে। আমরা দেখি বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের টাকা ব্যয় হয় না, পরবর্তীকালে দুর্নীতি, অপচয় হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি—উন্নয়ন প্রকল্প নাম দিলেই তো সেটা উন্নয়ন প্রকল্প হয় না। বাংলাদেশে যত বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প আছে তার বেশিরভাগই হলো দেশের জন্য মহাবিপদের প্রকল্প। সেটা উপকূল জুড়ে কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বলি কিংবা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বলি, এই প্রকল্পগুলো মানুষের চোখে ধাঁধাঁ লাগাতে পারে, বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে, কিংবা বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশ নিজেকে সেল করতে পারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদে বড় নিরাপত্তাহীনতার কারণ হবে এসব প্রকল্প। সরকার যদি এই বাদনামটা ঘুচাতে চায় তাহলে এই সকল প্রকল্পই বাতিল করা উচিত। আমরা গতকাল দেখলাম রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সুরক্ষা খরচ আবারও বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্পের বিশাল টাকা শুধুমাত্র পরিবেশগত বা জীবনের নিরাপত্তা বা আর্থিক ভাবেই না সার্বিকভাবে দেশের জন্য একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প থেকে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে এবং বাতিল করে সেই অর্থ বরং স্বাস্থ্যসেবায়, কৃষি খাতে শিক্ষা ও গবেষণায়; আমাদের জাতীয় সক্ষমতা বাড়াতে, পাটশিল্পসহ পরিবেশবান্ধব যে সমস্ত শিল্প, সেগুলোর জন্য ব্যয় করা উচিত।

একটা অন্তর্বর্তীকালীন বরাদ্দ দিয়ে আগামী কয়েক মাস আমাদের চলা দরকার ছিল এবং আগামী বছরের শুরুতে যে বাজেট করা হবে, সেটায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা নির্দেশনা যদি না দেয়, তা হলে বাংলাদেশ করোনাকালে যে বিপদে পড়লো, এরকম বিপদে পৃথিবীর খুব কম মানুষই পড়েছে সেখান থেকে বের হওয়া যাবে না। করোনায় সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার যতগুলো টেস্ট হচ্ছে সেই তুলনায় সংক্রমণের হার বেশি, সংক্রমণের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর বাইরে করোনাকালীন সময়ে যেভাবে অনাহার এবং কর্মহীনতায় মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং যেভাবে অন্যান্য রোগে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। সরকার প্রতিদিন যে মৃত্যুর হার প্রকাশ করছে এটাও সাংঘাতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। করোনার লক্ষণ নিয়েও অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে, যাদের টেস্ট হচ্ছে না। টেস্ট করার জন্য মানুষকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে, সারা রাত অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তারপরও টেস্ট করাতে পারছে না। টেস্ট না হলে আমরা প্রকৃত চিত্রটা কখনই জানতে পারবো না। সরকার সংক্রমণ ও মৃত্যু হার কম দেখানোর জন্য টেস্ট বাড়ানোতেও কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সস্তায় টেস্ট করার জন্য একটা কিট তৈরি করলেও, সেটা একটা চক্রে আটকা পড়েছে। মানুষের চিকিৎসা নাই, হাসপাতালে ঢুকতে পারছে না, করোনার টেস্ট না করালে ঢুকতে দিচ্ছে না। এইরকম একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় খুব কম দেশের মানুষ আছে। এই বিপদগ্রস্ত অবস্থা কাটবে না যদি উন্নয়নের দর্শন পরিবর্তন না হয়। উন্নয়নের মহাসড়ক বলে একটা কথা চালু হয়েছে, বাংলাদেশ কোন উন্নয়নের মহাসড়কে নাই, আছে একটা মহাবিপদের মহাসড়কেই ছিল। সেইটার পরিণতিই হচ্ছে আজকের এই পরিস্থিতি।

একটা দেশের মাথা পিছু আয় ৫০ হাজার ডলার হলেও সেখানে মানুষ যদি বিনাচিকিৎসায় মারা যায়, কোন একটা মহামারি, দুর্যোগের ধাক্কা যদি সামাল দিতে না পারে, সে দেশকে আমরা কী করে উন্নত বলবো? আবার একটা দেশের জিডিপি যদি এক হাজার ডলার হয় বা তারও কম হয়; সেই দেশের নাগরিকদের যদি যে কোন বিপদের সময় খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকে, চিকিৎসার ব্যবস্থা

থাকে, সেইটাই তো উন্নত দেশ। উন্নয়নের সংজ্ঞা ও দর্শন আমাদের পাল্টাতে হবে। এবং সেই পাল্টানোর জায়গাটা হচ্ছে অর্থনীতি ও রাজনীতি।

সকলের মধ্যে এই বিষয়টা যদি পরিষ্কারভাবে না আসে, সামাজিক সম্মতি, জনমত যদি তৈরি না হয়, তাহলে তো এটা পরিবর্তন হবে না, সরকার তো পরিবর্তন করবে না। এই জনমতটা শক্তিশালীভাবে তৈরি করার জন্য রাজনীতিবিদদের যেমন দায়িত্ব আছে, অর্থনীতিবিদদেরও দায়িত্ব আছে। বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদদের একটা সমস্যা হলো তারা পরিসংখ্যানের ঘোরের মধ্যে থাকে। এই পরিসংখ্যানের ঘোর থেকে বের হয়ে কোয়ালিটির জায়গাটা দেখা দরকার।

আমি মনে করি আমাদের প্রধান দাবি হওয়া উচিত সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা। এইটা প্রণয়নের জন্য উন্নয়নের ধরনের পরিবর্তন দরকার। আর দুই নাম্বার হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা। এক সময় বাংলাদেশে এটা ছিলো। যদি রেশনিং ব্যবস্থা না থাকতো তা হলে '৭৪-এ যত মানুষ মারা গিয়েছে, তার চেয়েও অনেক বেশি মানুষ মারা যেত। পূর্ণাঙ্গ রেশনিংসহ সামাজিক নিরাপত্তা, দাবি আকারে আসা উচিত। এখন বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের ও স্বাস্থ্য খাতের নানা প্রজেক্ট নিয়ে আসছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ। এরা যখন প্রজেক্ট নিয়ে আসে তখন সরকারের অনেকে আনন্দিত হচ্ছে কিন্তু এটা ভীতিকর ব্যপার। কারণ এদের প্রজেক্ট দিয়েই পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা বাতিল হয়েছিল, কৃষিতে এই দুরবস্থা তৈরি হয়েছে, স্বাস্থ্যসেবার এই অবস্থা তৈরি হয়েছে।

আমাদের এই দাবিগুলো সোচ্চারভাবে তোলা দরকার যে, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, সামাজিক সুরক্ষা, পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা। আগামী বাজেটে বর্তমান ধারার বদলে যাতে নতুন একটা ডিরেকশনে যেতে পারে সেজন্য সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনমত জোরদারভাবে তৈরি করা দরকার। এইখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, সবাইকে ধন্যবাদ।

ড. বিনায়েক সেন বলেন, আপনারা রাজনৈতিকভাবে বা রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কোথায় জোর দেবেন, সেটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে আমি দু-চারটি কথা বলছি। কোন সন্দেহ নেই যে, একটা গুচ্ছ আলোচনা হয়েছে যেটা শর্ট টার্ম বা আশু করণীয় নিয়ে। লকডাউন হয়েছে বা শিথিল লকডাউন হচ্ছে বা হবে সেটার সম্ভাব্য প্রভাব কীভাবে মোকাবিলা করা যায়। তার জন্য শ্রমিকের আয়ের সুযোগ দিতে হবে, মেডিকেল টেস্ট, করোনা বা অন্যান্য রোগ, আমাদের অপ্রতুল স্বাস্থ্য খাতের যে সমস্যা সেইসব আলোচনা হয়েছে। সেখানে সামাজিক সুরক্ষা আছে, শিল্প প্রণোদনা আছে, সেটা হয়েছে। এখানেও অনেকে করেছেন। সেটাও আপনারা আলোচনা করবেন অবশ্যই। সারাদেশে মাত্র ৩৯৯টি আইসিইউ ইউনিট, ৩১ হাজার ৮৪০টার মতো বেড আছে। আমরা একই সময় কী পরিমাণ সহায়তা দিতে পারি করোনা রোগীকে; এগুলো তো বলা বাহুল্য, আপনারা তুলে ধরবেন। কিন্তু আমি বিশেষভাবে উৎসাহী যে এই সংকটটা কী করে মধ্য মেয়াদে কতগুলো সংস্কার আনার ক্ষেত্রে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, সেটা সালেহ উদ্দিন আহমেদ কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, দুই একটা উদাহরণ টেনে। যেমন, প্রথমেই বলতে চাই যে, আমাদের মধ্যে অনেকদিন বিতর্ক হয়েছে যে, প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্য সেবা বনাম প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এটা অমর্ত্য সেনের বহু আগের লেখার প্রেক্ষিতে এই বিতর্কটার জন্ম হয়েছিল '৯০ এর দশকে বা ২০০০ দশকে। মনে হচ্ছিল যে, প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্য সেবা ও হতে পারে বা প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও হতে পারে। কিন্তু এখন এই সংকটের ফলে এটা স্পষ্ট প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কম কার্যকর প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্য সেবার চেয়ে। এটা জোরেসোরে আপনাদের তরফ থেকে বলা উচিৎ। সরকার পরিচালনা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেরালা, ভিয়েতনাম, কিউবা যেমন আছে, তেমনি তাইওয়ান আছে নিউজিল্যান্ড আছে। মানে মূল বক্তব্যটা হচ্ছে সর্জজনীন স্বাস্থ্য সেবা। এইটাকে একটা মৌলিক ধারণা হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে এই সঙ্কট থেকে যদি একটা কিছু নিয়ে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, সেটা হচ্ছে সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য সেবার ধারণা। সালেহ উদ্দিন ভাই যে উদাহরণ দিয়ে বললেন যে ওরা বলতে চায় যে স্বাস্থ্য খাতে বেশি বরাদ্দ দিয়ে কি হবে ওরা তো ব্যয় করতে পারে না। ৩১,৮৪০টা বেড আর ৩৯৯টা আইসিইউ, এইটা হচ্ছে জিডিপি ০.৭%। আমরা যদি জনস্বাস্থ্য খরচের বরাদ্দ ৩% এ নিয়ে যেতে পারি, আইসিইউ'র সংখ্যাও বাড়বে, মেডিকেল টেকনোলজিস্টের সংখ্যাও বাড়বে, আমাদের বেডের সংখ্যাও বাড়বে, হসপিটালের সংখ্যাও বাড়বে। ইউনাইটেডে কি হয়ে গেল? বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা নির্ভর আইসোলেশন বেড, সেখানে পাঁচ পাঁচ জন রোগী পুড়ে গেল এবং সেখানে কোন এটেন্ডেন্ট ছিল না। এটা দেশের অন্যতম ভালো হাসপাতালগুলোর মধ্যে একটা। সুতরাং এখানে একটা ক্ষোভ, একটা রাজনৈতিক ক্ষোভ প্রকাশ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়, যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি, যে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সার্বজনীন স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝবো, সার্বজনীন স্বাস্থ্য এর মধ্যে কি আনবো। আমার সাধারণ কথা সেটা বিশেষজ্ঞরা নির্ধারণ করুন। কেরালার মডেল দেখুন, ভিয়েতনামের মডেল দেখুন, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ানের মডেল দেখুন, নিউজিল্যান্ডের মডেল দেখুন। দেখুন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, সেখানে মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সাথে জরুরি স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি। সকলের জন্য এটা থাকতে হবে। তারপর দ্বিতীয় যে পরিবর্তনটা আমি চাচ্ছি, মধ্য মেয়াদে, যেটা আপনারাও চাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে আপনারা বলেওছেন, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা। আমাদের এখন সময় এসেছে, এই দুর্যোগে, আমি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার তৈরি করেছি, এটি এই মুহূর্তে সার্কুলেট করা যাচ্ছে না যেহেতু এটা যন্ত্রস্থ কিন্তু তাতে হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৬ এর ২৪% থেকে বেড়ে মিনিমাম হিসেবে ২০২০ সালে ৩৩% এ চলে যায় মাথা পিছু অনুপাত। প্রায় দেড় কোটি মানুষ ন্যূনতম দারিদ্র সীমার নিচে অলরেডি চলে গেছে, এবং যারা দারিদ্র সীমার মধ্যে ছিল তাদের ৭০% মানুষ চরম দারিদ্র সীমার নিচে চলে গেছে। এইরকম ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে যে ত্রাণ পৌঁছাবেন, কীভাবে পৌছাবেন? আপনার তো মেকানিজম নাই। এই যে এস. এম. ই এর কথা আকাশ ভাই বললেন, ক্ষুদ্র কুটির, মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের, স্মল এন্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজকে

পৌঁছানোর জন্য আমাদের রাস্তা নাই, ব্যাংকিং কোন সিস্টেম নাই, কারণ তাদের অনেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই। সেই জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার জন্য ভারতের আধার কার্ডের মতো আমাদের এনআইডিকেও আধার কার্ডের পর্যায়ে উন্নীত করা হোক। অর্থাৎ এনআইডি কার্ডের সাথে সে কোন পদ্ধতির সুবিধাভোগী, কোন কর্মসূচির সুবিধাভোগী, সেই তথ্যও থাকবে। আপনি রাজস্থানে গিয়ে জনধন কর্মসূচিতে যে ৩ হাজার টাকা বা ২ হাজার টাকা করে পান, সেটাও পেতে পারেন , যদি আপনি আটকা পড়ে যান। কিন্তু আপনি দ্বিতীয় বার পশ্চিমবঙ্গে এসে সে টাকাটা দাবি করতে পারবেন না জনধন কর্মসূচির আন্ডারে। কারণ ওটা ওই আধার কার্ডের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক্যালি লিংক করা আছে, ডিজিটালি লিংক করা আছে। আমরাও মধ্য মেয়াদে এইরকম একটা সিস্টেম চাই যে আমাদের এনআইডি কার্ড টিপলে বা নাম্বার টিপলে জানা যাবে সে কি বয়স্ক, সে কি বিধবা ভাতা পায়, সে কি ইজিপিপির সদস্য, সে কি অন্য কোন ট্রান্সফার প্রোগ্রাম পায় নাকি এই বর্তমানে যে ২ হাজার ৫০০ টাকার কথা সে সেটার সুবিধাভোগী। এখানে লিকেজের কথাটা বলছি এই কারণে যে আমাদের বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায়, আমার ওই পেপারটিতেই আছে যেটাতে হিসেব করে দেখিয়েছি, যে প্রায় ৫০% চলে যায় টপ ৫০% এর কাছে, যাদের ওখানে থাকাই উচিৎ না। আর মাত্র ২৫-৩০% যায় দরিদ্র, চরম দরিদ্র পরিবারের কাছে, আর মাঝখানের ওই অংশটা পায় সংকটাপন্ন যারা তারা। কিন্তু ওই টপ ৫০% লিকেজ আপনি বন্ধ করবেন কি করে, এজন্য আপনার ডিজিটাল সিস্টেম থাকতে হবে। এবং চতুর্থ যেটা আমার প্রস্তাব সেটা হচ্ছে এই করোনার কালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে মুস্তাফিজ ভাই যেটা শুরু করেছিলেন, যে শ্রেণি বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে, কোন সন্দেহ নেই। এটা শুধু টেলিমেডিসিনের ক্ষেত্রে না, এটা টেলি-এডুকেশনের ক্ষেত্রেও। আমাদের ছেলেমেয়েদের ইন্টারনেট এক্সেস আছে, সেখানে তারা দিব্যি হোম কোচিং, ক্লাস নিচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, এগুলো চলছে শহরাঞ্চলে। মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, ধনীদের ক্ষেত্রে। কিন্তু গরিবদের কোন ইন্টারনেট এক্সেস নেই, তাদের ফোন থাকতে পারে একটা করে, কিন্তু আমাদের স্মার্টফোন পেনিট্রেশন হচ্ছে অনলি ২৫%। সুতরাং এইখানে ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মের যে অসমতা, সেটা ভূমির অসমতার চেয়েও ভয়াবহ। ভূমির অসমতা থাকলে আপনি লিজ নিতে পারেন, স্থায়ী ভাড়া, যেটা হচ্ছে, ভাড়াটিয়ার অধিকার, এখন ভূমিহীনরা অধিকার হারাচ্ছে। যেটা শরমিন্দ নিলোর্মি বললেন যে, বিআইডিএস কৃষিতে কিছু কাজ করছেনা, এটা সঠিক নয়। এটা দেড় বছর আগে আমি নিজে একটা পেপার পড়েছিলাম বাংলাদেশর ভূমিহীনদের অধিকার। ইন্টারনেটের অসমতা সম্পর্কে আমাদের কথা বলতে হবে, এবং এইটাকে জোরেশোরে ধরতে হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য, সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা এবং ইন্টারনেট সমতা, এই ৩টা হলে, এবং অবশ্যই প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্য সেবা ধরতে হবে, কিন্তু আমি বাস্তব কথা বলি, ধরেন সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার জন্য আমাদের একটা খানাতথ্য আছে বিবিএস-এর। আপনারা জানেন ৩ বছর জরিপ করে বিবিএস একটা নিম্নতম দরিদ্রদের চিহ্নিতকরণ বলে একটা খানা তথ্যপঞ্জি তৈরি করেছে। সেইটা আমরা কাজে লাগাই নাই বিপদের এই সময়ে। আমি ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন অর্থ মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তখন ওনারা বললেন যে ২০১৯ এর মধ্যে এটা কার্যকর হবে। আজকে ৫ মাস হয়ে গেছে, ওই তথ্যপঞ্জি আমরা ব্যবহার করি নাই। ওই তথ্যপঞ্জি ব্যবহার করলে কাজে আসতো এইটা একটা ভাল তথ্যপঞ্জি, এটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যায়। এটা দিয়ে সম্ভাব্য কারা অতি দরিদ্র, কারা মধ্যম দরিদ্র, কারা সংকটাপন্ন এরকম বিভাজন করা সম্ভব। এই বিপদের সময় যখন আপনি রিলিফ দিতে যাচ্ছেন তখন এটা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই ৫ মাসে তো সেই তথ্যগুলো অনেকখানি গোলমেলে হয়ে গেছে। যে আগে মধ্যম দরিদ্র ছিল সে এখন চরম দরিদ্র হয়ে গেছে। র‍্যাংকিং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার জন্য আপনাকে আবার দ্বারস্থ হতে হবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড মেম্বারদের কাছে। কারণ তারাই জানে যে রক্ষিত তথ্য অনুযায়ী আপনি যাদেরকে রিলিফ দেবেন বলছেন, তারা এখন কি অবস্থায় আছে। সুতরাং আপনাকে কোন না কোন অংশগ্রহণমূলক তথ্যে যেতে হবে, আপনার এনএইচডি, জাতীয় খানা তথ্যের মতো যেটা বিবিএস রেখেছে ব্যবহার করতে পারেন। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনাকে এনএইচডি ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু আপনার একটা বিকেন্দ্রীক অবস্থা দরকার। আর থার্ড হচ্ছে যে, আমি জানি না, এই সকল সময়ে সকল দুর্যোগে আমরা দেখেছি সকল দল এবং মতকে নিয়ে ত্রাণ কমিটি, দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি, ১৯৯৮ সালে আপনাদের মনে আছে নাগরিক দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি নামে একটি কমিটি হয়েছিল, আমি নিজে তখন আতিউর রহমানের সাথে, আমাদের প্রাক্তন কলিগ, বিআইডিএস এ, তার সাথে মিলে আমি জামালপুরে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি কোন সমন্বিত উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি না, দৃশ্যত দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত হচ্ছে, কিন্তু আমি দৃশ্যত দেখতে পাচ্ছি না। এখন এইরকম একটা বিপদের সময়ে আমি মনে করি, যেটা সালেহ ভাই বলেছেন, এটা কি করে সম্ভব সরকারিভাবে দেখা। আমি শেষ কথা বলবো একটু দার্শনিক ভাবেই বলি, মিশেল ফুকোর দুটো কনসেপ্ট আছে যাকে আপনারা প্রাসঙ্গিক মনে করতে পারেন, একটা হচ্ছে ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার এবং বায়োপাওয়ার। প্লেগ, ১৩৪৬-৪৭ সালের যে ব্ল্যাক ডেথ, সেটা যখন আসলো, তারপর থেকে কোয়ারেন্টাইনের ধারণা শুরু হল, এবং কোয়ারেন্টাইনটা তখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, আপনারা যদি ব্রেখটের নাটক দ্যা লাইফ অফ গ্যালিলিও পড়েন বা দেখেন, সেখানে একটা বিখ্যাত দৃশ্য আছে, গ্যালিলিও বেরিয়েছে প্লেগের মধ্যে, ফ্লোরেন্সে, একদল সৈন্য এসে তাকে বলল এই তুমি বেরিয়েছ কেন তুমি ঘরে ঢুকো এবং জোর করে তাকে ঢুকিয়ে দেয়। এই কোয়ারেন্টাইন মডেলটা হচ্ছে ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার, মানুষকে ডিসিপ্লিন করার চেষ্টা করা, আপনি হাঁচি দেবেন না, মাস্ক পরে বের হবেন, আপনি ঘরের মধ্যে থাকেন, এটা হচ্ছে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত শরীর, নিয়ন্ত্রিত মনে পরিণত করা, এটাকে করতে হয়, নিয়মে। কিন্তু এই সিস্টেমটা যেটা প্লেগের জন্য কার্যকর ছিল, যখন কলেরা মহামারি ১৮২৯ সালে আসলো, ইংল্যান্ডে, তখন এটা ধ্বংস হয়ে যায়। তখন এটা কার্যত কাজ করে না। তখন দেখা গেল

জীবযাত্রার মান না বাড়ালে, কেবলমাত্র এই কোয়ারেন্টাইন মডেলে আমরা এই জনস্বাস্থ্য দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারবো না। কারণ কলেরার মতো মহামারিগুলো, যক্ষ্মার মতো মহামারিগুলো ডিমান্ড করে যে আপনি যে অবস্থায় আছেন সেটা। এবং আপনার যদি মনে থাকে ১৮৩০ এবং ৪০ এর দশকে চার্টিস্ট আন্দোলন, সে সময় মার্কস লিখেছেন হাউজিং প্রবলেম, এঙ্গেলস লিখেছেন কন্ডিশন অফ ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড, এই যে ডিসকোর্স হয়েছিল, সেই ডিসকোর্স থেকে যে কনসেপ্ট জন্ম নিল, বায়োপাওয়ার, যে রাষ্ট্রকে শুধু ডিসিপ্লিন করলেই চলবে না, তাকে উন্নত স্বাস্থ্য দেওয়া একটা কর্তব্য। তার ইমিডিয়েট ফলশ্রুতি হচ্ছে যে ভিক্টোরিয়ান আমলে মাটির নিচে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, সর্বপ্রথম লন্ডনে, এবং এখানে ব্যাপক বিনিয়োগ হয় ১৮৫০-৬০ এ। এবং পরবর্তীতে সেই আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলগুলো আপনারা জানেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শেল্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফুকো বলছেন যে এই বায়োপাওয়ারটা যে ট্রানজিশন হলো সেটা হচ্ছে একটা বড় ধরণের মহামারিজনিত কারণে, প্লেগ থেকে অন্যান্য ধরণের মহামারিগুলো। এখন আমার যেটা রিডিং, সেটা হচ্ছে এদেশের সরকার ও রাষ্ট্র, বা তৃতীয় বিশ্ব বলতে গেলে, সেটা কখনও ডিসিপ্লিনের পাওয়ারও সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পারে নাই, এই সময়ও পারছে না, এই স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা এটা সেটা, মোটামুটি ছেড়ে দিচ্ছে দায় দায়িত্ব, বায়োপাওয়ারেও উন্নীত হতে পারেনি। এখন এই বায়োপাওয়ারকে কত কার্যকরভাবে গণমুখী করা যায়। সেটা আমাদের পরবর্তী সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আমি শর্ট টার্ম যে সমস্ত প্রতিষেধকের কথা বলা হয়েছে, চলাচল বৃদ্ধি, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মানা সাপেক্ষে গার্মেন্টস খুলে দেওয়া, আমি নিজেও প্রথম আলোতে একটা অপিনিয়ন লিখেছিলাম, দু-তিন সপ্তাহ আগে, সেখানে বলেছিলাম অর্থনীতির দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং স্বাস্থ্যের দিকে চোখ রাখতে হবে, সেখানে আমি এইসব শর্ট টার্ম এর কথা বলেছিলাম। তো মিডিয়াম টার্মের কথাগুলো তখন বলিনি, এখন বললাম। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, আজকের আয়োজনের বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের আলোচনা শোনার চাইতে রাজনীতিবিদদের আলোচনা শোনা বেশি দরকার। কারণ, পরিস্থিতিটা তো নির্ভর করবে আমরা রাজনীতিটা কীভাবে করছি এবং রাজনীতির দর্শনটা কী হবে, সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে যে, আমরা আসলে কী ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যাবো। এইটা একটা রাজনৈতিক বিষয়। সেই রাজনৈতিক বিষয়টা মীমাংসা করতে পারলে আলোচনার পথটা সোজা হয়ে যায়। আমি মনে করি বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনের কারণ প্রাক-করোনা যুগেই ছিলো। করোনা পরিস্থিতি অর্থনীতিকে আরোকটা ধাক্কা দিয়েছে। আমরা দেখবো যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি, দরিদ্র হ্রাসের কথা, ব্যাংককিং খাত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থনীতির একটা পুনর্গঠনের তাগিদ বাংলাদেশে আগেই বিদ্যমান ছিলো। করোনা পরিস্থিতি সেটাকে আরও পরিষ্কার করে সামনে নিয়ে এসেছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে চিত্র পাই তাতে আমাদের দরকার হচ্ছে পুনর্গঠন পরিকল্পনার। এখন সেই পুনর্গঠন পরিকল্পনার আলোকেই আমাদেরকে বাজেটটা করতে হবে। বাজেট করার আগে যদি আমরা আলোচনাটা শুরু করি সাপ্লাই চেইন দিয়ে, তাতে দেখব অর্থনীতির যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে সেগুলো হয়েছে সারাবিশ্বে। যেমন, অর্থনীতির অতিমাত্রায় আর্থিকীকরণ। অর্থাৎ 'মানি ইন, মানি আউট' ফিনানশিয়ালাইজেশন। আমরা ব্যবহারিকমূল্য খাতে প্রাধান্য দেয়া লক্ষ্য করি না। সবসময় প্রাধান্যটা দেই বিনিময়মূল্য খাতে। অর্থাৎ সবসময় বিনিময় মূল্যকে নিয়েই অর্থনীতিকে সাজানোর একটা চেষ্টা রয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বড় রকমের বিযুক্তি ঘটেছে। কর্মস্থলে প্রযুক্তি আসলেও কর্মঘণ্টা কমেনি। কর্মঘণ্টার মধ্যে শোষণ বেড়েছে, বিভাজনকারী রাজনীতির আধিপত্য বেড়েছে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কী ধরনের পরিবর্তনের স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি। তার আগে দরকার হচ্ছে ব্যবহারিকমূল্য বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে তার প্রয়োজোনীয়তার জোগান করতে পারে। তার সাথে দরকার হচ্ছে সর্বজনের শোভন জীবনমান। কারণ, আমরা পৃথিবীব্যাপী দেখেছি যে, রিটার্ন অন ক্যাপিটাল অনেক বেড়ে গেছে, রিটার্ন অন লেবার বাড়েনি। আমাদের দ্বিতীয় রকম পরিবর্তনের চিন্তা করতে হবে। আমাদের অনেকের

চিন্তার মধ্যে কেইন্সীয় চিন্তার প্রভাব আছে কিন্তু কোনওভাবে সেটা কেইন্সীয় চিন্তা নয়। কারণ আমরা অবশ্যই চাই যে, সার্বিকভাবে গড় চাহিদা বাড়ুক। সেইজন্যে ব্যাপক বিনিয়োগ দরকার। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শুধু অর্থনীতি বাড়লেই হবে না, দেখতে হবে কর্মসংস্থান কত বেড়েছে, সেটিই হচ্ছে নিয়ামক। শুধুমাত্র অর্থনীতি বাড়লে কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ে না, সেটা কাম্যও হতে পারে না। এই নানামুখী কাজ করবে যদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিত্তিক কর্মসূচি থাকে এবং বিনিয়োগ জনগণের জন্য হতে হবে। এর জন্য পুরো উৎপাদন ব্যবস্থার একটা রূপান্তর দরকার। আমরা দেখছি জলবায়ুর পরিবর্তন, বায়োডাইভার্সিটি ডিপ্রেশন। জীবাশ্ম জ্বালানির যে রাজনীতি, সেখান থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর দরকার। এই প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হলে সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা দরকার তাহলো সক্রিয় নাগরিক। অর্থাৎ নাগরিকদের যদি সক্রিয় ভূমিকা না থাকে, রাষ্ট্র যদি তার ন্যায়সঙ্গত অবস্থানে না যায়, লেজিটিমেসি না থাকে, তাহলে কোনোকিছুই পালিত হবে না। এ জন্য যে প্রাধান্যগুলো প্রয়োজন তা হলো, সার্বজনীন মৌলিক অধিকারগুলো পাওয়ার নিশ্চয়তা। সেখানেই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ব দেয়া দরকার বাম গণতান্ত্রিক জোটের।

আমাদের সংবিধানের ১৪ থেকে ২০ ধারা আছে মূলনীতি এগুলোকে মৌলিক অধিকারের জায়গায় নিতে হবে। অর্থাৎ মূলনীতিকে কীভাবে মৌলিক অধিকারে পরিণত করা যায়। সে বিষয়ে একটা কর্মসূচি হতে পারে। সেইক্ষেত্রে সার্বজনীন ইউনিভার্সাল ব্যাসিক নিড যদি হয় আমাদের লক্ষ্য, সেটা করতে গেলে তার পরিপূরক কর্মসূচি থাকতে হবে। দান-খয়রাত, ত্রাণভিত্তিক দেশের সামাজিক-নিরাপত্তা জাল তা ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট এর কালে ধরেই নেয়া হয়েছে কিছু লোক

পিছিয়ে পড়বে এর জন্য সামাজিক-নিরাপত্তা জাল দরকার। এই যে জালে উঠিয়ে নিয়ে আসা হলো, সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং সেখানে একটা পূর্ণ জীবনভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দরকার। অর্থাৎ আয় সহায়তা দরকার, বেকারত্ব ভাতা, শিশু প্রতিপালন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, অবসর ভাতা, আবাসন, স্বাস্থ্য ভাতা দরকার। এগুলো সবই সংবিধানের ১৪ থেকে ২০ ধারায় উল্লেখ আছে। এগুলো করতে হলে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের কত পার্সেন্ট জিডিপি দরকার? আমরা হিসাব করে দেখেছি ৬% জিডিপি দিয়ে এই ভাতাগুলো দেওয়া সম্ভব।

তারপরে স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাটা ঠিকমতো হচ্ছে না বলে মনে হয়। কারণ, আলোচনাটা হচ্ছে বাজেটের আকার, অথবা ব্যয় ব্যাবহার নিয়ে। আসলে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রকৃত চিত্রটা কোভিড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের মূলসমস্যা হলো আনসার্টেনিটি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইকোনোমিকস অফ মেডিক্যাল কেয়ার। সেখানে তিনি পরিষ্কার দেখিয়েছেন ডিমান্ড-সাপ্লাই কায়দার যে বাজার অর্থনীতি সেটা আসলে কখনো কাজ করে না। কোথাও কাজ করেনি। এটা নিয়ে আমরা বাহাস করতে পারি যে, কেনো বাজার কাজ করবে না। ডিমান্ড-সাপ্লাই ওয়ালা যারা–নিও ক্ল্যাসিকাল ইকনোমিস্ট, তারাই এইটা নিয়ে সন্দিহান আছেন। সেইক্ষেত্রে যারা বাজারের উপরে আস্থাশীল তারা মনে করেন বাজারই এটা দিবে, আসলে কোথাও দেয়নি এবং দিতেও পারে না। সেজন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ইউনিভার্সাল ব্যাসিক নিড এর জায়গায় নিতে হলে অর্থাৎ প্রত্যেকে যোগ্যতা অনুসারে করবে এবং প্রত্যকের কর্মানুযায়ী পাবে। এই নীতি কি বাংলাদেশে বাস্তবায়ন সম্ভব? আমরা যদি জনসংখ্যার তথ্যভাণ্ডার করি এবং যেটা করাও সোজা। কারণ, ইতিমধ্যেই আমাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ড করা হয়েছে। তার সাথে যদি আমরা কতগুলো কলাম যোগ করে দেই এবং সেই কলামে আমাদের প্রোভার্টি মিন্স টেস্টিং থেকে শুরু করে অন্যান্য তথ্য থাকতে পারে যার দ্বারা প্রত্যেকটা নাগরিকের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ডাক্তার ও চিকিৎসা সেবা থাকবে। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল হেলথ সিস্টেম, নট ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ। বাংলাদেশের হেলথ রেগুলেশনের যে অবস্থা তাতে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার করণীয় সম্পর্কে। এটা করতে গেলে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ অন্তত জিডিপির ৩% লাগবে।

মানুষের কর্মক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এবং উন্নত করতে আমাদের দরকার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করে ঠিক করা যে, কেন স্বাস্থ্য কমিশন দরকার, কেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের পরিবর্তন করা দরকার। আলোচনাটা দরকার শিক্ষা নীতির, ব্যবস্থাপনার এবং দার্শনের। তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও শ্রমশক্তির দক্ষতার হার, ব্যাপক শিক্ষিত যুব বেকারের কাজ দেয়ার দর্শন। আমার বিদেশ থেকে কমপক্ষে আড়াই লাখ শ্রমশক্তি আনি। তাদের বেতন হিবেবে যে টাকাটা দেই সেটা বাইরে চলে যায়। তাদের কাছ থেকে করবাবদ-ও যদি টাকা কাটা হয় তাহলে দেড় বিলিয়ন ডলার পাওয়া সম্ভব। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে দক্ষতা বাড়াতে পারলে বাইরে থেকে শ্রমশক্তি আমদানি করতে হতো না। এরপরে দরকার প্রকৃত খাতের উৎপাদন বহুমুখীকরণ, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন।

আমাদের কৃষি উৎপাদন এককেন্দ্রিক। রপ্তানিমুখী উৎপাদনের কথাও বলা হয়েছে, সেটি সর্বৈব অর্থেই এখন ঝাঁকুনি খেয়েছে। আমাদের দেশীয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের অংশ হতে পারি। সেইটা যদি করতে হয়, তাহলে একদিকে যেমন বহুমুখীকরণ করতে হবে, অন্যদিকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা তিন ধরণের তহবিলের কথা চিন্তা করতে পারি। প্রথমত, বৈচিত্রকরণ তহবিল; দ্বিতীয়ত, সবুজ শিল্পায়ন তহবিল এবং তৃতীয়ত দেশব্যাপী গ্রামীণ শিল্প উজ্জীবনী কাঠামো। অর্থাৎ গ্রামে কীভাবে শিল্পটা নেয়া যায়। যেমন, থাইল্যান্ডে আছে 'ওয়ান থাম্পুন, ওয়ান প্রোডাক্ট'। অর্থাৎ প্রতি জেলায় কীভাবে উৎপাদন গ্রোথ সেন্টার করা যায় সে চিন্তা করতে হবে। এটা করতে গেলে আমাদের এখন জিডিপির যে অংশ চলতি বাজেটে রয়েছে সে বরাদ্দ দ্বিগুণ করলেই এটা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান আসবে কোথা থেকে? সে প্রস্তাব বাম গণতান্ত্রিক জোটকে করতে হবে। আমার বিবেচনায় সেটা হতে পারে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো। যেমন, ক্যাপাসিটি সাবসিডি সেটা প্রায় ৮ বিলিয়নের মতো। তারপরে আছে ওএসডির কথা। বাজারে গুজব আছে ৩০ তারিখের মধ্যে সব কাজ করে বিল নিয়ে নেওয়ার ব্যাপার–সেইটাও একটা। তাহলে এখান থেকে যে টাকাটা বাঁচবে সে টাকাটা নেয়া যেতে পারে। অথবা ইউএনও-কে কত টাকার গাড়ি দেবেন, বা এই ব্যবস্থায় যে সমস্ত চেনা-জানা প্রতিষ্ঠানকে যে কর সুবিধা দেয়া হয় সেটা না করলে টাকা বাঁচবে। দ্বিতীয় হচ্ছে সহজে কর আদায় করা যায় এরকম খাত বের করা। আমি আগেই বলেছি যে আড়াই লাখ যদি বিদেশি থাকে, তাদের কাছ থেকে দেড় বিলিয়ন ডলার আনা সম্ভব। তারপর ট্রান্সফার প্রাইসিং, তারপর বিচারাধীন যে মামলা আছে, যেগুলো শালিস করে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এবং সেখান থেকেও আয় আসতে পারে। যেসমস্ত পুঁজি পাচার ঘটেছে, সে পুঁজি ফেরত আনা। দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক উৎস থেকে অনুদান বাড়ানো। এইক্ষেত্রে চারটা জিনিস হতে পারে। প্রথম, পাইপলাইনে যেইগুলো আছে, সেইগুলোকে কীভাবে করোনা ফান্ডে ট্রান্সফার করা যায়, সেটা একটা উৎস হতে পারে। দ্বিতীয়ত যে ঋণ মওকুফ বা ট্যাক্স হলিডে হচ্ছে এগুলো এটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃত উপায়। তারপরে দেখা কোন জায়গা থেকে আমরা ঋণ করবো। তাহলে দীর্ঘমেয়াদী, কম সুদে, সেইসমস্ত সূত্র থেকে ঋণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারি বিল এইগুলো সবগুলোরই সুদের হার বেশি। আর টাকা ছাপতে হতে পারে। টাকা ছাপা সেই পরিমাণেই যাবে যে পরিমাণ সংকোচন ঘটেছে, এই সংকোচনকে অবসেট করা পর্যন্ত। এখন কোনোমতেই মূল্যস্ফীতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর বাজেট ঘাটতি এই পাঁচ শতাংশ থাকবে না। আমার হিসাব অনুযায়ী ৯.৭ শতাংশ হয়। রাজনৈতিক প্রশ্নটা আপনাদের দেখতে হবে। আপনাদের নির্ধারণ করতে হবে

আপনারা বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে কীভাবে দেখছেন আর বর্তমান শাসন ব্যবস্থা কী করতে পারে। তৃতীয়ত এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাম গণতান্ত্রিক জোটের কী করণীয়। এটা রাজনৈতিকভাবেই মীমাংসা করতে হবে এবং রাজনৈতিকভাবেই অ্যাটাকে যেতে হবে। আমার কাছে মনে হয়, পৃথীবিতে একটা পরিবর্তন সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে হবে। অর্থাৎ ডিমান্ড-সাপ্লাইর অর্থনীতির পুরোনো, পঁচা-গন্ধওয়ালা নীতি, তাদের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ আমি অন্তত দেখি না। তো সেইজন্যে ভবিষ্যৎ কী নির্ধারিত হচ্ছে তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার বক্তব্য শোনার জন্যে।

অধ্যাপক শারমিন্দ নিলোর্মী ডালিয়া বলেন, আমরা আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করলাম যে সরকার অন্যান্য বছর যে রেগুলার বাজেট প্রণয়ন করে থাকে এই বছরও তারা ঘোষণা করলো যে সে ধরণের একটা রেগুলার বাজেটই হবে এবং সেই অনুযায়ীই প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথচ পরিস্থিতি বিবেচনায় অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ হলো আমাদের কয়েক ধরণের ফেইজে ভাবতে হবে। একটা হচ্ছে রিকভারি ফেইজ। আজকের আলোচনায়ও বলা হয়েছে কোভিড-১৯ সময়কালীন এবং কোভিড-১৯ উত্তরকালীন কী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আমরা চাই সেটার বিষয়ে আলোচনা করতে। কোভিড-১৯ সময়কাল আমরা অতিক্রম করছি, উত্তরকালে কখন কোন সময় কথা বলতে পারবো সে বিষয়টা একেবারেই জানা নেই। ফলে একেবারে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এর মধ্যে আছি। তারপরও আমরা এই সময়কালে রিকভারি ফেইজ যেটা বলি তার জন্য একটা বাজেট আমাদেরকে আলাদাভাবে ভাবতে হবে। আরেকটা হচ্ছে আমাদের পুনর্বাসন ফেইজ। আমরা এই ফেইজটাকে পার করলে তিন মাস হোক, চার-ছয় মাস বা এক বছর হোক রি-বিল্ডিং এর দিকে যাবো।

সবগুলোর বিন্যাস এবং পুনর্গঠনের দিকে যে যাব বাজেটে তাঁর নিশ্চিত একটা দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। এ বছর প্রবৃদ্ধি না হয় তিন শতাংশ হবে। আগামী বছর পাঁচ শতাংশ হবে তাঁর দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। আমরা গ্রোথ নিয়ে এখন কথা বলছি কেন? যেখানে মানুষ এখন নিজের জীবন নিয়ে পর্যুদস্ত-চিন্তিত, দিশেহারা আর আমরা আলোচনা করছি গ্রোথ নিয়ে। কথা বলতে হবে যে, মানুষের জীবন বাঁচাতে হলে যে বিনিয়োগগুলোর প্রয়োজন তাঁর সাথে এই প্রবৃদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে। আমরা ধরে নিচ্ছি একটা অনুমতিই হচ্ছে সুশাসন। অর্থাৎ সরকার ধরে নিচ্ছি বাজেটে যে বরাদ্দ থাকবে সেটা সুশাসনের সাথে প্রয়োগ হবে এবং আমাদের ইকোনমিতে সেটা যথার্থভাবে চলে আসবে। সে কারনেই ব্যাংকিং সেক্টরের কথা বলা হচ্ছে। যদিও আমরা জানি, গত মাসে অনেক ধরণের খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়েছে। শুধু পুনঃতফসিল নয় এদেরকে একেবারেই মাফ করে দেওয়া হয়েছে। ধরুন বিআইডিএস এর বাৎসরিক যে অনুষ্ঠানগুলো হয় বিভন্ন সেশন উনারা আয়োজন করেন কিন্তু কৃষি নিয়ে সেশন গত দুবছরে আমি অন্তত দেখিনি। অর্থাৎ কৃষি শুধু রাজনীতিবিদদের কাছে নয়, অর্থনীতিবিদদের কাছেও খুব কম আলোচিত, কম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এ সময়ে আমরা মনে করছি যে কৃষিকে খুব গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যদিও কৃষির এই প্রস্তুতি আমাদের কৃষকরা নিজেরাই নিয়ে নিবে। এখনো বোরো ধানটা পুরোপুরি উঠেনি। যে সমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই সমস্ত অঞ্চলের একটা অ্যাসেসমেন্ট অতি দ্রুত প্রয়োজন। ওখানকার মানুষের স্বাস্থ্য এবং আগামী ছয় মাস বা যত দিন না বাঁধটা ঠিক হয় এই ক্ষতিগ্রস্ত লোকগুলো কোথায় থাকবে বাজেটে সুরক্ষা দিয়ে বিশেষ প্রায়োরিটি দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষগুলো কীভাবে বাঁচবে সেই পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আমি এটাও মনে করি 'নতুন দরিদ্র' যে শব্দটা আমরা শুনছি তাঁদেরসহ দুই কোটি পরিবারের হিসাব আমরা দেখছি। দুই কোটি পরিবারকে আট হাজার টাকা করেও যদি প্রতি মাসে দেয়া হয় তা হলে লাগবে ১৬ হাজার কোটি টাকা তিন মাস দিতে লাগবে ৪৮ হাজার কোটি টাকা। আমি মনে করি সামাজিক সুরক্ষা খাতে এই টাকাটা বরাদ্দ করা খুবই জরুরি। একটা বিতর্ক আছে যে, মানুষকে নগদ টাকা হাতে দিব নাকি সরকারি সিস্টেম থেকে কেনাকাটা করে বাড়ি বাড়ি পৌছে দেয়া হবে। এটা হলে খুবই ভালো হতো যে, রাষ্ট্র যদি প্রান্তিক বা খোদ উৎপাদকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারতো। কিন্তু দুঃখিত এটা হবে না, কারণ যদি সুশাসন থাকতো তা হলে এটা সম্ভব হতো। ফলে ঝুকি নিয়েও বলতে হচ্ছে যে, তাঁদেরকে নগদ-ই দেয়া হোক এবং ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে।

আমাদের অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা এখনো তৈরি হয়নি। এই বাজেটের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। যেটা আগামী তিন কিংবা পাঁচ বছরের শুধু আর্থিকনীতি নয় এক ধরণের ইনক্লুসিভ এবং ডিস্ট্রিবিউটিভ ক্রিস্টাল পলিসি অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বচ্ছ বিতরণ নীতি আমরা কীভাবে নিতে পারি সেটার একটা ইঙ্গিত এখানে থাকতে হবে। আমরা বলেছি বটে কৃষকেরা অনেক ভাল করেছেন। সামনে আমাদের আমনের মৌসুম আসছে তার ওপরে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এটাই আমাদের শ্রম ঘন খাত। কীভাবে আমনে বীজ সুরক্ষিত করা যাবে। নারীরা এখন অধিক পরিমাণে কৃষি খাতে আসছে। কীভাবে তাঁদের সুরক্ষা করা যায় সে দিকে মনোযোগ দিতে হবে। নারীদের যে দুধের শিল্পটা আছে কয়েকটা উঠান মিলিয়ে ছোট ছোট পরিসরে। প্রাণ, আফতাব সেখান থেকে দুধ সংগ্রহ করে। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের কাছে আমরা কীভাবে এগুলোকে সংগ্রহ করে সারাদেশে বণ্টনটা করতে পারি এগুলোর প্রতি মনযোগী হবার জন্য আর্থিক বরাদ্দ যেমন প্রয়োজন তাঁর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রটোকোল এবং প্রস্তাবনা সেটার প্রয়োগ।

আমি স্বাস্থ্য বিষয়ে কয়েকটা বিষয় বলতে চাই, একটা হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের টেস্ট। টেস্টের কোন ধরণের বিকল্প নাই। টেস্ট হতে হবে, খরচটা হতে হবে মানুষের সাধ্যের মধ্যে। টেস্ট দু কারণে প্রয়োজন। একটা হচ্ছে মানুষের জীবন বাঁচানো আরেকটা হচ্ছে আমাদের যদি ইকোনমি খুলেই দিতে হয় তা হলে জানতেই হবে যে কে সুস্থ আর কে সুস্থ নয়। যে সুস্থ নন তাঁকে নিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে পারবো না এবং এটা ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য আমি মনে করি যে টেস্টের কিট মানুষের আওতার মধ্যে আনা প্রয়োজন।

প্রয়োজনে সরকার সেখানে ভর্তুকি দিবেন এবং সেগুলো স্থানীয় পর্যায়ে যেন পিকআপে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারি। আমাদের সিভিল সার্জন অফিসে একজন দক্ষ জনশক্তি আছে। তাঁদের বাড়ি বাড়ি শুমারি করা আছে যে, কোন বাড়িতে কতজন মানুষ আছেন এবং তাঁদের বয়স রেঞ্জ কেমন। আমাদের এই ডেটাবেজের উপরে ভিত্তি করে সিভিল সার্জন অফিসের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি টেস্টিং এর দায়িত্বটা তাদেরকেই দিতে হবে। ফলে স্বাস্থ্য খাতে আরও ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা এবং সিভিল সার্জন কে আরো ক্ষমতায়িত করে তাঁর রেভিনিউ করাটা আমি মনে করি খুব জরুরি।

আরেকটা জরুরি বিষয় হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। যেটা নিয়ে আমরা এই কোভিডের পরিস্থিতিতে কথা বলছি না। বাচ্চা হওয়া তো রেগুলার একটা প্রসেস। এই সার্ভিস দিতে পারতে হবে। শুধু বাচ্চা হওয়া না প্রজনন স্বাস্থ্যের সাথে আরও অনেক বিষয় জড়িত। এই বৈশ্বিক মহামারির সময়ে প্রয়োজনীয় অনেক জরুরি সেবা দেয়ার সক্ষমতা আমাদের নাই। কর্মসংস্থানের বিষয়ে বিশেষত, যারা অদক্ষ শ্রমিক, বিদেশে আছে তারা ফিরে আসবে বেশির ভাগই গ্রামে ফেরত যাবে তারা খুব কমই শহরে থাকবে। এই অদক্ষ শ্রমিকদের গ্রামমুখি কর্মসংস্থান কতটা করা যাবে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই ব্যাপারে একেবারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা বাজেটে থাকতে হবে। সর্বশেষ যে কথাটা বলবো–যে ছাত্র এখন মাস্টার্স পরীক্ষা দিবে সেও কিন্তু চাকরি তেমন পাবে না। আমাদের একটা দক্ষ জনগোষ্ঠী আছে যারা ইংরেজি পারে, যাদের কম্পিউটার শিক্ষা আছে। এই জনগোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল লিটারেসি যেটা বাইরে রপ্তানি করতে পারবো সেই বরাদ্দটা জরুরি ভিত্তিতে দেয়া প্রয়োজোন।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, এতক্ষণ ধরে আমাদের আলোচকবৃন্দ আলোচনা করলেন। এখানে আমাদের সিনিয়র নেতারাসহ বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ সংযুক্ত আছেন। বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে মন্তব্য আকারে কিছু বলার জন্য সঞ্চালক বলেছেন।

সম্মানিত আলোচকদের সাথে আমার দীর্ঘ পরিচয়। অনেকেই আমার সহপাঠী ছিলেন। সিনিয়রও ছিলেন একজন। আমি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, এর আলোকে বাজেট সম্পর্কে বলতে চাই। আমার এক্সপ্লেনেশন দিয়ে বলার সুযোগ নাই। করোনা পরিস্থিতি বিশ্ব বাস্তবতার ক্ষেত্রে চলমান কতগুলো বিষয়কে পরিষ্কারভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। সেটা আমি ব্যাখা করছি। আগামী দিনের বিশ্ব আর করোনাপূর্ব বিশ্ব ঠিক এক ধরণের থাকবে না। এবং নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের অগ্রসর হতে হলে বিশ্বের কথাই বলি আর আমার দেশর কথাই বলি তাহলো অর্থনীতিতে বদল আনতে হবে, রাজনীতিতে বদল আনতে হবে।

আমি আমাদের দেশ সম্পর্কে বলি। এইটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় যেটুকু বিশ্লেষণ ক্ষমতা আমার রয়েছে, সেটার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে, আমাদেরকে এখন চপোটাঘাত করে করোনা জানিয়ে দিয়েছে যে, এখনই তোমার অর্থনীতির বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন করা এবং এখনই শ্রেণিশক্তির পরিবর্তন করা। এগুলো না করতে পারলে ক্রমাগতভাবে পরবর্তীধাপে নূতন নূতন করোনার ভয়াবহ অবস্থা দেখব। দ্বিতীয়ত বলতে চাই, বাজেট প্রণয়নের গতানুগতিক চিন্তা, সালেউদ্দিন ভাই এটা বলে গেছেন। তারা কেরানিকে বলবেন–গতবারের বাজেটটা আনতো। এর পর এই খাতে ১০ যোগ করে, এই খাতে ২০ বিয়োগ করে। এই যোগ-বিয়োগের হিসাবের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কিংবা এইবার জিডিপির প্রবৃদ্ধির ৭% দেখাতে হবে। এখন আপনারা পরিসংখ্যান বসিয়ে দিন। আমাদের রাষ্ট্র এইভাবেই চলছে, নির্বাচনসহ। বলে দেওয়া হয়, এটাই শেষ ফলাফল তুমি পরিসংখ্যান বসাও। এবং করোনার সময়ও যে তথ্য আমাদের দেওয়া হচ্ছে, কতজন আক্রান্ত হলো, ফলটা পূর্ব নির্ধারিত। বলে যে, তোমরা, সংখ্যাটা পূর্ণ কর। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে। শেষ ফল থেকে আমাদের চিন্তা করতে হবে শেষ ফল কি ? আমরা কী চাই?

তিনি বলেন, সবচেয়ে জরুরি মানুষের জীবন। সে অর্থে তার জরুরি হলো স্বাস্থ্য, শিক্ষাব্যবস্থা। সবচেয়ে জরুরি হলো প্রত্যেক নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা। আমি মনে করি সামাজিক কাঠামোর কার্যকলাপের জন্য জিডিপি-র, কমপক্ষে ১০-১১% বরাদ্দ দিতে হবে। বাজেটের আরেকটা অংশ দিতে হবে শিল্প বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে। তৃতীয়াংশ, সেটা খরচ করতে হবে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য। এহলো মোটা দাগে প্রস্তাব। তারপরে এটাকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হোক। উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়েছে এগুলো এই আলোকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, জুলাই থেকে জুন এগুলো নির্ধারণ করতে হবে। দেখেন, যখন আক্রান্তের সংখ্যা ১০-১২ জন দৈনিক, তখন লকডাউন। আমার চোখের সামনে এখনো ছবিটা ভাসে। বৃদ্ধ মাস্টার সাহেব, তাকে পুলিশ কান ধরে ওঠবস করাচ্ছে। কেনো লকডাউন ভেঙে তুমি আসলা। আর এখন যখন প্রত্যেকদিন আড়াই-তিন হাজার সংক্রমণ। এখন কোন পরিকল্পনা ছাড়া, বিশেষজ্ঞদের মতামত না নিয়েই ঢালাও ভাবে লকডাউন উঠিয়ে দেওয়া হলো। এখানে উল্লেখ করেছে কীভাবে এই লকডাউন এবং সমস্ত মানুষকে বলা হচ্ছে তোমরা গৃহ-অন্তরীণ হয়ে থাক, বের হয়ো না। সে অবস্থায় আদালতের অনুমতি না থাকা সত্তেও অপরাধী, অভিযুক্ত ডাকাত অ্যারোপ্লেন ভাড়া করে দেশ থেকে চলে গেলো। যে এই লুটেরা ধনিকদের কাছে এটা পরিত্যাক্ত দেশ। তারা এখানে থাকবে ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। সমস্ত বোঝাটা জনগণের উপরে দিয়ে। কিন্তু আমাদের হাতে ক্ষমতা দিবে না। এহচ্ছে পরিস্থিতি। আমি রাজনৈতিক দিকটা বেশি বললাম অর্থনৈতিক দিকটা কম বললাম। আমি মনে করি এইখান থেকেই বাজেটের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া।

তিনি আরও বলেন, পঞ্চাশ বছর পার করে দিলেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমরা মানতে রাজি না। এইসব বিষয় যে কেবল লক্ষ্য নয়, এইটা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। সুতরাং মৌলিক অধিকারের এই প্রশ্নগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের আগামী দিনের বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। আমি খালি এই একটা প্রসঙ্গই মনে করি যে, এইটা হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় অ্যাপ্রোচ। এখনকার সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার বিধানটা বলা হয়েছে আমাদের অবস্থা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতির মতো । এখানে অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে তখন আমরা কী বলেছিলাম, যাদের ট্রেনিং আছে তারাই শুধু মুক্তিযুদ্ধ করবে, অন্যরা কেউ কোরো না? আমাদের করোনায় যাদের ডাক্তারি জানা আছে তারাই খালি করবে, আর কেউ কিছু করবা না? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ স্বাস্থ্য ভলান্টিয়ার আমরা করতে পারতাম না? তাদেরকে টেস্টিং শেখাইতে পারতাম না? তাদেরকে দিয়ে মাইক দিয়ে প্রচার করে স্বাস্থ্যবিধি কীভাবে অনুসরণ করতে হবে তার প্রদর্শনী এবং ব্যাখ্যা আমরা জনগণের কাছে করতে পারতাম না? বলা হলো যে, ঘরে বসে থাকো। তাহলে করোনায় মরবা না। বিরাট ওষুধ দিলো। কিন্তু ওষুধের চেয়ে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তো আরো বিপদজনক। না খেয়ে মরবে। তা সেই লোককে আপনি ঘরে রাখতে পারবেন? তখন কেনো ঘোষণা করা হলো না, যে আগামী তিনমাস বা ছয়মাস দুই কোটি মানুষকে বা দুই কোটি পরিবার যেটাই বলেন, সেটা হিসাব করে বের করা যাবে। তাদের খাবার, নগদ অর্থসহ অন্যান্য সাহায়তা সরকার দেবে। বিনায়ক হিসাব করে বলে দিয়েছে যে, দুই কোটি মানুষ নূতন করে দরিদ্র হবে। সিপিবি থেকে বলা হচ্ছে পৌনে দুই কোটি মানুষকে খাদ্য সাহায্য এক্ষুণি দেওয়ার কথা এগুলো হলো হিসাব করে বের করার ব্যাপার। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির শিক্ষিকা ডালিয়া, সে তো হিসাব করে বললো কত হাজার কোটি টাকা লাগে। এটা কোন মতেই আমাদের বাজেটের ১০% এর বেশি না। তো এসব খয়রাতি কেনো দিবো? এ বাজেটের টাকা কারো ব্যক্তিগত টাকা না। এটা জনগণের টাকা। আমরা সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে এটা জমা রেখেছি। তাহলে আমরা আমাদের প্রয়োজনে এবং বিপদে এই টাকা খরচ করবো। আমি আর সময় নিতে চাই না আরও যারা আছেন তারা বলবেন।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মতামত রেখে আমাদের অনেক সমৃদ্ধ করেছেন, সেজন্য তাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বর্তমান সময়ে করোনা মহামারি থেকে সৃষ্ট দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই অবস্থা থেকে উত্তোরণ ও পুনর্গঠনের বিষয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন মতামত দিয়েছেন, দেশের আর্থিকনীতি, রাজনীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থার অকার্যকারিতা, ভবিষ্যতে তার পরিবর্তনের তাগিদ, রূপরেখা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনায় এসেছে। প্রায় ৪০-৫০টি অতিগুরুত্বপূর্ণ বা বড় ধরণের ঘাটতি, দুর্বলতা, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, দুঃশাসনের বিষয় মত দিয়েছেন, সংকট উত্তোরণে আর ১৫-২০টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশ তারা রেখেছেন। তার সঙ্গে যাকে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র বলা হয় এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে গেলে বা ভবিষ্যতের সঙ্কট মোকাবিলা করতে গেলে চলতি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা বহাল রেখে এটা যে করা যাবে না এই মতামতও দিয়েছেন। এর জন্য বাম গণতান্ত্রিক জোটের ওপর একটা দায়িত্বও তারা দিতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের বলার চেয়েও আগামী দিনে সে দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে পারবো যে মতামতগুলো তারা দিয়েছেন সে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা জোটের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবো। কারণ জনগণের সচেতনতা আর তাদের ঐক্যের শক্তি গড়ে তুলে এই ব্যবস্থার বদল, সেটা যদি আমরা না করি, যদি সংগ্রাম না করি, তাহলে অবস্থারও বদল হবে না। মতামতেরও কার্যকারিতা থাকবে না।

তিনি আরও বলেন, আমাদের সংবিধানের কথা, মুক্তিযুদ্ধের মূল অঙ্গীকারের কথা এসেছে, ফলে আমূল বৈপ্লবিক রূপান্তরের লক্ষ্যে এই মুহূর্তে একটা মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। পরিবর্তণটা কী হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে আমরা কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি এবং কীভাবে সে ভূমিকা পালন করবো সে বিষয়ে আলোচনা করা রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি প্রয়োজন বলে মত দিয়েছেন। আমি আবারও এই আলোচকদেরকে এই ব্যাপারে মতামত রেখে আমাদেরকে শুধু সমৃদ্ধ করা নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, কর্মদিশার ক্ষেত্রেও যে মতামত ও সুপারিশ তারা রেখেছেন, সেজন্য তাদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

কমরেড সাইফুল হক বলেন, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে যে সকল অর্থনীতিবিদরা আলোচনা করেছেন সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা একটা খুবই কঠিন সময় পার করছি। আগামীকাল থেকে লঞ্চ, ট্রেন, বাস, দোকানপাট সবই খুলে যাবে। তারা যেটা ওয়াদা দিয়েছেন সেটা রাখেননি। এই রকম একটা দুর্যোগকালীন সময়ে জীবন এবং জীবিকা বিরোধী অবস্থানে আছে। জীবিকা জীবনকে যখন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে তখন সরকারের উচিত জনগণের দায়িত্ব নেয়া, বিশেষ করে যারা ভুক্তভুগি মানুষ তাদের। লক ডাউন তুলে দেয়া মানে, মানুষের দায়-দায়িত্ব না নেয়ার সরকারের যে অপারগতা এবং সীমাহীন নিষ্ঠুরতা বাস্তবে এটা তারই একটা স্বীকৃতি। এই রকম একটা অবস্থায় মানুষ যে কথা বলবে, প্রতিবাদ জানাবে তারও কোন জায়গা নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও যারা লিখছেন, কার্টুন দিচ্ছেন, মতামত ব্যক্ত করছেন, তাদের গ্রেফতার করছে, মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। আজকে এটা স্পষ্ট যে সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ও প্রতিনীধিত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার কারণেই এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে যে ধরণের উন্নয়ন হয়েছে, সেটা দিয়ে মহামারি মোকাবিলা করা সম্ভব না সেটা করোনা মহামারি-ই প্রমাণ করেছে। উন্নয়নের যে দর্শন অর্থাৎ উন্নয়নের অগ্রভাগে কারা থাকবেন সেটা আজ খুব জরুরিভাবে পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে।

আগামী বাজেট নিয়ে সম্মানিত অলোচকবৃন্দ বলেছেন, দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মোটেও জনকল্যাণমূলক নয় এবং উন্নয়নের যত কথাই সরকার বলুক না কেন এই উন্নয়ন মোটেও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নয়। আগামী ১১ জুন সরকার বাজেট পেশ করবে সেখানে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি ইউনিয়ন থেকে মহানগর পর্যন্ত যে ভঙ্গুর দশায় রয়েছে তার উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্যগত দুর্যোগে অর্থনৈতিক দুর্যোগ ইতিমধ্যই দৃশ্যমান হয়েছে। আমরা ধারণা করছি অভিবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স কমে আসবে। ফলে আমাদের কৃষির, জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার। সরকার ভর্তুকির জন্য যে বরাদ্দ দিচ্ছেন তাতে যাদের উপকার হওয়ার কথা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা উপকৃত হচ্ছেন না। গ্রামীণ শিল্প ও কৃষি রক্ষা না করতে পারলে করোনা পরবর্তী সময়ে যে সংকট তৈরি হবে তা কাটানো যাবে না। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে কর্মসংস্থানের উদযোগ তা নেয়া ছাড়া এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আমি পরিষ্কারই মনে করি আগামী তিন বছর রাজস্বখাত থেকে জনগণের জন্য যা অতিব প্রয়োজন সেখানে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার এবং যত ধরনের বিলাসী দ্রব্যসহ যেগুলো মানুষের জন্য জরুরি নয় সেগুলো আমদানি বন্ধ করা দরকার। আমাদের যে সম্পদ আছে তা যদি সুষ্ঠু ব্যবহার করা হয় তাহলে এরচেয়ে দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করা সম্ভব। অর্থাৎ সরকারের যদি জনগনের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ব থাকে তাহলে ঋণ খেলাপিদের পাচারকৃত টাকা, কালো টাকা অপ্রদর্শিত আয় এগুলি যদি উদ্ধার করে তাহলে বর্তমানের চেয়ে দুইগুণ তিনগুণ রাজস্ব আয় করা সম্ভব। সরকার প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী যে ধরণের প্রকল্প অব্যাহত রেখেছেন সেগুলির বরাদ্দটা কমিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানুষের মৌলিক বিষয়গুলোকে যদি গুরুত্ব দেয় আমি বিশ্বাস করি এই সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে। অনেকে কেরালার উদাহরণ দিলেন, কেরালা আবার কিউবার মডেল অনুসরণ করেছে, অর্থাৎ জনবান্ধব, জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল জনগণের কথা শুনবে, জনগণের মতামত নিবে এই রকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া যেখানে ন্যূনতম জনগনের ভোটাধিকার নেই, জনগনের স্বাধীন মত প্রদানের কোন সুযোগ নেই সেখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া এগুলো আশা করা যাবে না। আজকে যে প্রস্তাবনাগুলো আলোচকরা দিয়েছেন তা যুক্ত করে সামগ্রীকভাবে আমরা বাম গণতান্ত্রিক জোট আন্দোলন গড়ে তুলবো। সরকারের দায়িত্ব ছিল এই স্বাস্থ্যগত দুর্যোগকে জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করে একটি সমন্বিত জাতীয় কমিটি গঠন করা এবং অগ্রাধিকার ঠিক করে তার সমাধানের চেষ্টা করা। এখন পর্যন্ত সরকার একলা চলো নীতিতে রয়েছে, দলবাজি করছে। এখন দলবাজি করার সময় না। এই রকম একটা সময়ে যদি সরকারকে বাধ্য করা না যায় তাহলে আমরা এই পরিস্থিতির বিশেষ কোন পরিবর্তন করতে পারবো না। আজকের আলোচকরা যে মুল্যবান অলোচনা করলেন তা আমরা বাম জোটের মিটিং এ আবারও অলোচনায় তুলে সামনের দিনে আন্দোলন গড়ে তুলবো। সবাইকে ধন্যবাদ।

কমরেড হামিদুল হক বলেন, বাম গণতান্ত্রিক জোট রাজনৈতিক সংগ্রামে আছে। রাজনৈতিক সংগ্রাম হচ্ছে জনগণের মুক্তির সংগ্রাম, বিপ্লব করার সংগ্রাম। এই মুহূর্তে জরুরি দুটি বিষয়ে আমি কথা বলছি। একটা হচ্ছে আমরা তো একটা নিকৃষ্টতম স্বৈরশাসনের অধীনে আছি। আমাদের না, কারোর কথাই সরকার শুনছে না। তারপরও আমরা বলবো, জনগণকে সাথে নিয়ে বলবো, আমরা গণদাবি বারবার উত্থাপন করবো। এক্ষেত্রে দুটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা, আরেকটা হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা। তা আমি সর্বজনীন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছি যে, স্বাস্থ্যনীতিটা কি হবে, অবিলম্বে রোগ প্রতিরোধের স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করতে হবে, এবং স্বাস্থ্যখাতকে সামাজিক খাত ঘোষণা করতে হবে, এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসাকে অধিগ্রহণ করে এটাকে রাষ্ট্রীয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় পরিণত করতে হবে। এবং প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হেলথ কার্ড দিতে হবে। আর জরুরি ভিত্তিতে আগামী ৬ মাস বা ১ বছরের মধ্যে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। আর খাদ্য না পাওয়ার ব্যাপারে আমার মন্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে, এই খাদ্য উৎপাদন দিয়ে জনগণকে সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থায় আনা সম্ভব। আনু মুহাম্মদ একটা দাবি তুলেছেন এবং ৭৪ সালের একটি উদাহরণও দিয়েছেন। সর্বজনীন যে রেশনিং ব্যবস্থা, নিম্ন আয়ের, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তের জন্য অন্তত পক্ষে চাল, ডাল, আটা, চিনি, তেল, লবণ, দুধ এই ৭টি পণ্য অবিলম্বে সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থায় আনা দরকার। আর এই ৭টি পণ্যই বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় কিছু পণ্য হয়ত আমদানি করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অগ্রগতি, কৃষি বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি, বাংলাদেশে চাল, ডাল, ফলমূল, এবারই দেখা গিয়েছে, তরমুজ কিংবা বিভিন্ন ফলমূল যেভাবে উৎপাদন হয়েছে, তা নষ্ট হচ্ছে। অবশ্যই রাষ্ট্রকে উৎপাদিত পণ্য কিনে নিতে হবে, এবং এই পণ্য আবার জনগণের কাছে বিক্রি করতে হবে। আরেকটা বিষয়ে হচ্ছে যে আমাদের একটা জিনিস খুব লক্ষণীয়, আজকে বাংলাদেশ প্রতিদিনে একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে, তার হেডলাইন হল বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা বাড়ছে। এবং দ্রুততম সময়ে ধনী হবার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ আবারও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। একদিকে বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা বাড়ছে বলা হচ্ছে, অন্যদিকে ধনীদেরকে বিভিন্ন প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ধনীদেরকে প্রণোদনা না দিয়ে এই যে ধনীর সংখ্যা বাড়ছে, তাদের কাছ থেকে ওয়েলথ ট্যাক্স আদায় করা দরকার এবং কালো টাকা সাদা না করে কালো টাকা উদ্ধার করতে হবে। বিদেশে পাচার করা টাকা ফেরত আনতে হবে। দুটি তহবিল একটা হল খাদ্য নিরাপত্তা তহবিল, আরেকটা হল স্বাস্থ্য নিরাপত্তা তহবিল, এই দুটি তহবিল বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বড় আকারের তহবিল গঠন করা সম্ভব। তা আমাদের দেশে ধনীর সংখ্যা বাড়ছে, আবার লিবিয়াতে চাকরির সন্ধানে গিয়ে মানুষ খুন হচ্ছে, এই হল অবস্থা। নিকৃষ্টতম পুঁজিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরণের অবস্থা থাকবে। আমরা জরুরি দাবি নিয়ে রাজপথে থাকবো। আমাদের লক্ষ্য সামাজিক বিপ্লব, এই নিকৃষ্টতম পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ। এই লড়াই আমরা অব্যাহত রাখবো, সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন।